ভারত-গৌরব-গ্রন্থাবলী

রামমোহন রায়

সিটী বুক সোসাইটী,

৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রকাশক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার।

বৈশাখ, ১৩১৫।

মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

ভারত-গৌরব-গ্রন্থাবলী

আমাদের জন্মভূমির সহস্র দুর্দ্দশা সত্ত্বেও এদেশে এমন সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা পৃথিবীর যে কোন দেশের পক্ষেই গৌরবস্থানীয় হইতে পারিতেন। এই সকল মহাত্মার জীবনের সুশিক্ষা এদেশীয় যুবকগণের চরিত্র-গঠনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। স্বদেশ-সেবা-ব্রতে দীক্ষিত বঙ্গীয় যুবকগণ যতই এই সকল মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কঠিন কর্ত্তব্যের পথে উৎসাহ ও নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইতে পারিবেন, ততই তাঁহারা স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবেন, সন্দেহ নাই। এই শুভ উদ্দেশ্য সংসাধনকল্পে আমরা—

—ভারত-গৌরব-গ্রন্থাবলী—

নামে দেশের প্রকৃত উজ্জ্বলরত্ন স্বরূপ মহাত্মাদিগের জীবন-চরিত ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

এই সকল জীবন-চরিত সংক্ষিপ্ত হইলেও, ইহাতে আলোচিত মহাপুরুষদিগের জীবনের যাহা কিছু মহৎ ও গৌরবের বস্তু—অর্থাৎ আমাদের জাতীয় চরিত্র গঠনের পক্ষে যাহা কিছু বিশেষ উপযোগী, তাহা সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ হইবে। এইজন্য বঙ্গের বহুসংখ্যক কৃতীসন্তান লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

[অপর পৃষ্ঠা দেখুন।

—প্রকাশিত হইয়াছে—

১৩১৫ সালের বিজ্ঞাপিত ১২ খানি জীবন-চরিতের মধ্যে নিম্নলিখিত ৩ খানি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। রামমোহন রায় ... ... ।/০

২। বিদ্যাসাগর ... ... ।/০

৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ... ... ।/০

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

১। ১৩১৫ সালের বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি বৎসর ১২ খানি করিয়া সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত প্রকাশিত হইবে।

২। এক বৎসরের ১২ খানি জীবন-চরিতের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩।৵০ তিন টাকা ছয় আনা মাত্র। হাতে হাতে লইলে কেবলমাত্র ৩৲ তিন টাকাতেই ১২ খানি জীবন-চরিত দেওয়া যাইবে।

৩। খুচ্‌রা হিসাবে ক্রয় করিলে প্রতি কাপীর মূল্য ।/০ পাঁচ আনা। ভিঃ পিঃ তে ।৵০ ছয় আনা লাগিবে।

৪। চিঠির উত্তরের জন্য রিপ্লাই-কার্ড বা ডাকটিকিট-সহ পত্র লিখিতে হইবে।

৫। টাকা কড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী,

৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ভারত-গৌরব-গ্রন্থাবলী

আমাদের জন্মভূমির সহস্র দুর্দ্দশা সত্ত্বেও এদেশে এমন সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা পৃথিবীর যে কোন দেশের পক্ষেই গৌরবস্থানীয় হইতে পারিতেন। এই সকল মহাত্মার জীবনের সুশিক্ষা এদেশীয় যুবকগণের চরিত্র-গঠনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। স্বদেশ-সেবা-ব্রতে দীক্ষিত বঙ্গীয় যুবকগণ যতই এই সকল মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কঠিন কর্ত্তব্যের পথে উৎসাহ ও নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইতে পারিবেন, ততই তাঁহারা স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবেন, সন্দেহ নাই। এই শুভ উদ্দেশ্য সংসাধনকল্পে আমরা—

—ভারত-গৌরব-গ্রন্থাবলী—

নামে দেশের প্রকৃত উজ্জ্বলরত্ন স্বরূপ মহাত্মাদিগের জীবন-চরিত ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

এই সকল জীবন-চরিত সংক্ষিপ্ত হইলেও, ইহাতে আলোচিত মহাপুরুষদিগের জীবনের যাহা কিছু মহৎ ও গৌরবের বস্তু—অর্থাৎ আমাদের জাতীয় চরিত্র গঠনের পক্ষে যাহা কিছু বিশেষ উপযোগী, তাহা সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ হইবে। এইজন্য বঙ্গের বহুসংখ্যক কৃতীসন্তান লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

[অপর পৃষ্ঠা দেখুন।

—প্রকাশিত হইয়াছে—

১৩১৫ সালের বিজ্ঞাপিত ১২ খানি জীবন-চরিতের মধ্যে নিম্নলিখিত ৩ খানি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। রামমোহন রায় ... ... ।/০

২। বিদ্যাসাগর ... ... ।/০

৩। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ... ... ।/০

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

১। ১৩১৫ সালের বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি বৎসর ১২ খানি করিয়া সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত প্রকাশিত হইবে।

২। এক বৎসরের ১২ খানি জীবন-চরিতের অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩।৵০ তিন টাকা ছয় আনা মাত্র। হাতে হাতে লইলে কেবলমাত্র ৩৲ তিন টাকাতেই ১২ খানি জীবন-চরিত দেওয়া যাইবে।

৩। খুচরা হিসাবে ক্রয় করিলে প্রতি কাপীর মূল্য ।/০ পাঁচ আনা। ভিঃ পিঃ তে ।৵০ ছয় আনা লাগিবে।

৪। চিঠির উত্তরের জন্য রিপ্লাই-কার্ড বা ডাক-টিকিট-সহ পত্র লিখিতে হইবে।

৫। টাকা কড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী,

৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ভূমিকা

ভারতে যিনি নবযুগের প্রবর্ত্তক, যাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার দীপ্তি আজ ভারতাকাশের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে, সেই ক্ষণজন্মা অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষ রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হইল। কি ধর্ম্মবিষয়ক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি শিক্ষা-সম্বন্ধীয়—ভারতের সর্ব্ববিধ মঙ্গলকর ব্যাপারে তাঁহারই হস্ত সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। স্বদেশ-সেবা-ব্রতে দীক্ষিত বঙ্গীয় যুবকগণ যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়া জননী জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিতে চাহেন, তবে এই মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণে সচেষ্ট হউন। এমন উচ্চ আদর্শ কেবল ভারতে কেন, পৃথিবীর আর কোথায়ও দৃষ্ট হইবে না।

প্রকাশক

ভারত-গৌরব-গ্রন্থাবলী

(প্রকাশিত হইয়াছে)

রামমোহন রায় ... ... ।/০

বিদ্যাসাগর ... ... ।/০

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ... ... ।/০

(প্রস্তুত হইতেছে)

আকবর

বুদ্ধদেব

অশোক

শিবাজী

প্রতাপ সিং

বঙ্কিমচন্দ্র

কেশবচন্দ্র

অক্ষয়কুমার দত্ত

দয়ানন্দ সরস্বতী
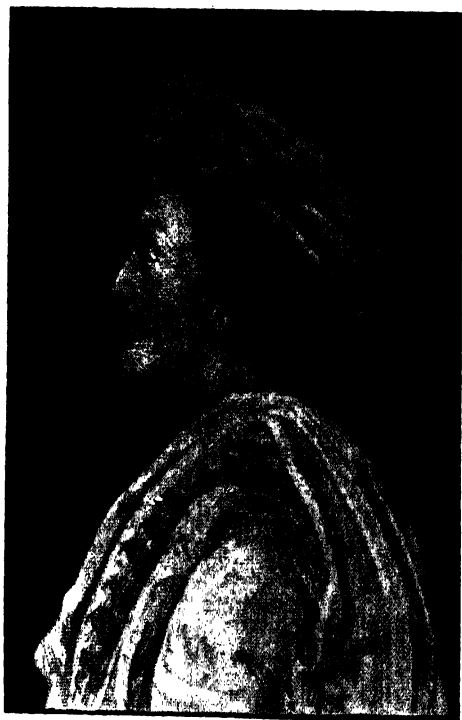
রামমোহন রায়

রামমোহন রায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্ম ও পরিচয়।

রামমোহন রায়, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে, হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহনের বংশ-তালিকা পাঠে জানা যায়, এই বংশের আদিপুরুষ কান্যকুব্জ হইতে পূর্ব্ব-বাঙ্গালার অন্তর্গত বাঙ্গালপাশ গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পরে মুর্শিদাবাদ এবং তদনন্তর হুগলী জেলায় ইঁহাদের বাসভূমি পরিবর্ত্তিত হয়। রামমোহন রায়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ পরশুরাম ব্রাহ্মণোচিত যজন-যাজনাদি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, বৈষয়িক উন্নতিকল্পে রাজকার্য্য গ্রহণ করেন, এবং নবাবের নিকট হইতে "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। তখন হইতে "রায়" উপাধি ইঁহাদের বংশগত হইয়াছে। রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যো-

পাধ্যায়ও নবাবের অধীনে কার্য্য করিতেন। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত শাঁকাসা গ্রামে কৃষ্ণচন্দ্রের নিবাস ছিল। কথিত আছে, নবাব তাঁহাকে খানাকুল কৃষ্ণনগরের চৌধুরীদিগের জমিদারীর বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য তথায় প্রেরণ করেন। গোপীনাথের শ্রীপাট দর্শনে পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণচন্দ্রের সেস্থান মনোনীত হওয়াতে, তিনি সন্নিহিত রাধানগরে আসিয়া বাস করেন। কৃষ্ণচন্দ্র একজন নিষ্ঠাবান্, ভক্ত বৈষ্ণব এবং সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—হরিপ্রসাদ, অমরচন্দ্র ও ব্রজবিনোদ। কনিষ্ঠ ব্রজবিনোদ নবাব সিরাজউদ্দৌলার অধীনে উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার হওয়াতে, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ব্রজবিনোদের সাত পুত্র, তন্মধ্যে রামকান্ত রায় পঞ্চম। ইনিই রামমোহন রায়ের পিতা।

অন্তিমকালে ব্রজবিনোদকে গঙ্গাতীরস্থ করা হইলে, শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী চাতরা-নিবাসী শ্যাম ভট্টাচার্য্য, ভিক্ষার্থী হইয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার এক কন্যার সহিত ব্রজবিনোদের এক পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় শাক্ত ও ভঙ্গ কুলীন, অপর দিকে ব্রজবিনোদ গোঁড়া বৈষ্ণব ও স্বরাইমেলের কুলীন ছিলেন। তিনি আর কি করেন? প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয়ে নিতান্ত অপ্রীতিকর

হইলেও এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। কিন্তু এই বিবাহে ছয় পুত্রই অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, কেবল পঞ্চম পুত্র রামকান্ত প্রসন্নমনে পিতৃসত্য পালন করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এই রামকান্ত এবং ভট্টাচার্য্য-নন্দিনী তারিণীদেবীই রামমোহনের জনক জননী।

তারিণীদেবীকে লোকে ফুলঠাকুরাণী বলিয়া ডাকিত। ঠাকুরাণী যেমনি বুদ্ধিমতী, তেমনি ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন। শাক্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি পরে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। শেষ অবস্থায় তিনি শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করেন। তাঁহার নিষ্ঠা এমনি বলবতী ছিল যে, অবস্থার স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি দীনবেশে পদব্রজে জগন্নাথ-দর্শনে গিয়াছিলেন, এবং সেখানে দাসীর ন্যায় স্বহস্তে সংমার্জ্জনী দ্বারা জগন্নাথের মন্দির পরিষ্কার করিতেন।

কোন সময়ে ফুলঠাকুরাণী, কনিষ্ঠপুত্র রামমোহনকে সঙ্গে লইয়া, পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। এক দিন শ্যাম ভট্টাচার্য্য পূজার পর রামমোহনের হস্তে বিল্বপত্র প্রদান করিলেন। রামমোহন বালক-স্বভাববশতঃ তাহা চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা তারিণীদেবী পুত্রের মুখ হইতে বিল্বপত্র ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাকে অভিসম্পাত করিয়া বলিলেন,—'তোর পুত্র বিধর্ম্মী হইবে।' কন্যা এই অভিসম্পাত শুনিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তখন

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—'আমার কথা কিছুতেই ব্যর্থ হইবে না,তবে তোর পুত্র রাজপূজ্য অসাধারণ লোক হইবে।'

রামকান্ত বর্দ্ধমান রাজ্যের কয়েকখানা গ্রাম ইজারা লইয়াছিলেন। সেই সূত্রে রাজার সহিত তাঁহার কলহ উপস্থিত হয়। ইহাতে রামকান্ত সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া, অতঃপর অধিকাংশ সময় তপ-জপে কাটাইতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানলাভ

রামমোহন যথাসময়ে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় প্রেরিত হইলেন এবং গৃহে মৌলবীর নিকট পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন পারস্য ভাষাই অর্থকরী রাজভাষা ছিল। রামমোহন আপনার অসাধারণ প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তির সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে পারস্য ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। নবম বৎসর বয়সে আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য রামমোহন পাটনায় প্রেরিত হইলেন এবং তিন বৎসরের মধ্যে উক্ত ভাষায় লিখিত কঠিন কঠিন শাস্ত্র ও কোরাণ পাঠ করিলেন। এই সকল গ্রন্থপাঠে তাঁহার প্রতিভা বর্দ্ধিত, বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও তর্কশক্তি তীক্ষ্ণধার হইল। কোরাণ-পাঠে ও মুসলমান মৌলবীগণের সংসর্গে তাঁহার মূর্ত্তি-পূজার প্রতি বিশ্বাস তিরোহিত হইল।

দ্বাদশবর্ষ বয়সে সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য রামমোহন কাশীতে যাইয়া চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিলেন এবং অল্প কালের মধ্যেই বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন। কোরাণ-পাঠে তাঁহার মূর্ত্তি-পূজায় বিশ্বাস দূরীভূত হইয়াছিল, উপনিষদ্ পাঠে তাঁহার মনে ব্রহ্মজ্ঞান বদ্ধমূল হইল।

২৪ বৎসর বয়সে রামমোহন ইংরাজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। পাঁচ বৎসর ইংরাজী শিক্ষায় তত মন দেন নাই; ২৮ বৎসর বয়সে ইংরাজীতে কোন রূপে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। তখনও ইংরাজী অর্থকরী ভাষা হয় নাই,— সে সময়ে আদালতে পারসী ভাষাই প্রচলিত ছিল।

কর্ম্মক্ষেত্রে রামমোহন ইংরাজী ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিলেন। তিনি বিশুদ্ধরূপে ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারিতেন, মনোযোগপূর্ব্বক ইউরোপীয় সংবাদপত্র সকল পাঠ করিতেন, ইউরোপীয় রাজনীতির গতি বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, এবং তৎসম্বন্ধে ইংরাজ বন্ধুদিগের সহিত তাঁহার আলোচনা হইত। ক্রমে রামমোহন ইংরাজী ভাষায় এতদূর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, যে সুপ্রসিদ্ধ ডিরোজিও সাহেব পর্য্যন্ত তাঁহার ইংরাজীর ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার “বাঙ্গালার ইতিহাস” পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, রামমোহন রায় সংস্কৃত, আরবী, পারসি, উর্দ্দু, বাঙ্গালা, ইংরাজী, গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, হিব্রু, এই দশ ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ডাক্তার কার্পেণ্টার প্রভৃতি বিলাতের প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পর্য্যটন।

রামমোহন রায় সংক্ষেপে যে আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন :—

"আমার বয়স যখন ষোড়শ বৎসর, তখন আমি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করি। এ বিষয়ে আমার সহিত আত্মীয় স্বজনের মতান্তর উপস্থিত হওয়াতে, আমি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হই, এবং নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া, ব্রিটিস শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ ভারতের বহির্ভূত কয়েকটী দেশ পর্য্যটন করি। কুড়ি বৎসর বয়সে আমি পিতা কর্ত্তৃক গৃহে আহুত হই। বাড়ীতে আসিয়া ইউরোপীয় শাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করি, ইহাতে তাঁহাদের প্রতি আমার যে বিদ্বেষ ছিল, তাহা তিরোহিত হয়। আবার আমি পৌত্তলিকতা, সহমরণ ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই, ইহাতে অনেকেই আমার বিপক্ষ-পক্ষ-অবলম্বন করেন, তজ্জন্য পিতৃদেব পুনরায় প্রকাশ্যরূপে আমাকে বর্জ্জন করেন। পিতার মৃত্যুর পর আমি অকুতোভয়ে অধিকতর সাহসের সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হই। আমি ভ্রমাত্মক মত সকলের বিরুদ্ধে এই সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে নানা ভাষায় বহুসংখ্যক পুস্তক ও

পুস্তিকা প্রকাশ করি। এই পুস্তক প্রকাশের পর দেশের লোক আমার উপর এতদূর উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, কয়েক-জন স্কটলণ্ডবাসী বন্ধু ব্যতীত সকলেই আমায় ত্যাগ করিলেন।

আমি হিন্দুধর্ম্মকে কখন আক্রমণ করি নাই; কিন্তু উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এখন প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই দেখাইয়াছিলাম,—হিন্দুগণ যে সকল শাস্ত্রকে মান্য করেন, তাহাতে পৌত্তলিকতা সমর্থিত হয় না। এত বিরোধ ও আক্রমণ সত্ত্বেও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন।"

রামমোহন রায়ের সত্যানুরাগ ও সৎসাহস কি আশ্চর্য্য! ঘোরতর কুসংস্কারে যখন সমগ্র দেশ নিমজ্জিত, শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে দেশাচার যখন পূর্ণ প্রতাপে সমাজ-বক্ষে রাজত্ব করিতেছে, সেই সময়ে, সেই অবস্থায়, ষোড়শ বৎসর বয়স্ক বালকের পক্ষে মূর্ত্তি-পূজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কি সাধারণ বীরত্ব! এই সত্যানুরাগের জন্য তিনি গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া, ভারতের সীমা উত্তরণ পূর্ব্বক তিব্বতে গমন করিলেন। যখন বাষ্পযানের যাতায়াত ছিল না, ভাল পথ ছিল না, দস্যু তস্করের ভয়ে লোক সকল সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত, সেই সময়ে একটী বাঙ্গালী বালক অভ্রভেদী হিমালয় উত্তরণ পূর্ব্বক তিব্বতে যাত্রা করিল! বিদেশীয় রাজত্বের প্রতি ঘৃণা বশতঃ ও বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্য তিনি তিব্বতে

গিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার কি স্বাধীনতা-স্পৃহা, কি সত্যানুরাগ, কি অনুসন্ধিৎসাই প্রকাশ পাইতেছে!

তিনি তিব্বতে যাইয়া সেখানেও মূর্ত্তি-পূজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। যিনি সত্যানুরাগের জন্য পিতা কর্ত্তৃক গৃহ-তাড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে তিব্বতে নর-পূজা দেখিয়া নীরব থাকা অসম্ভব। এই জন্য তিনি সেখানেও বিপন্ন হন। অনেকে তাঁহার প্রাণ বিনাশের উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কোমল-হৃদয়া তিব্বত-রমণীগণের দয়ায় তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান। তাঁহারা তাঁহাকে নানা বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন। রাজা নিজে বলিয়াছেন, তিব্বতবাসিনী রমণীগণের সস্নেহ ব্যবহারের জন্য তিনি চিরদিন নারী-জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও কৃতজ্ঞ থাকিবেন।
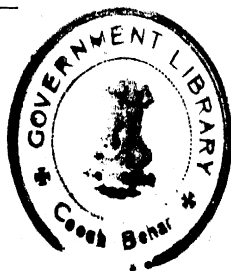
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ব্রতসাধন।

চারি বৎসর কাল নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া, রামমোহন গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পিতা রামকান্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই প্রেরিত লোকের সহিত রামমোহন গৃহে আগমন করিলেন। সন্তান-বৎসলা জননী ও স্নেহার্দ্রহৃদয় পিতা অনেক দিন পরে পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

রামমোহন গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত হিন্দুশাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার মনে যে একেশ্বরতত্ত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এখন বহু-শাস্ত্রপাঠে সেই অঙ্কুর বিশ্বাসরূপ মহাবৃক্ষে পরিণত হইল। তিনি হিন্দুশাস্ত্ররূপ ক্ষীর-সমুদ্র মন্থন করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমূল্য কস্তুভ প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার চিত্তকে প্রসারিত, জ্ঞানকে সুনির্ম্মল ও হৃদয়কে বলিষ্ঠ করিল। উত্তরকালে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারের জন্য যে মহা আহবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই সময়েই বিধাতা তাঁহাকে তাহার উপযোগী অস্ত্র, শস্ত্র ও বর্ম্মে সজ্জিত করিলেন।

তিনি শাস্ত্রপাঠে যে সত্য প্রাপ্ত হইতেন, পিতার সহিত তাহা লইয়া আলোচনা করিতেন। আলোচনা কখন কখন ঘোরতর তর্ক বিতর্কে পরিণত হইত। পুত্রের এইরূপ প্রচলিত ধর্ম্মে অনাস্থা দেখিয়া, পিতা রামকান্ত অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। রামকান্ত মনে করিয়াছিলেন,—পুত্র চারি বৎসর বিদেশে অসহায় অবস্থায় নানা ক্লেশ পাইয়া, যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছে, আর তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না; তাঁহার সে আশা নিষ্ফল হইল। ইহাতে রামকান্তের ক্রোধাগ্নি প্রবলতর হইয়া উঠিল। রামমোহন পুনরায় গৃহ হইতে তাড়িত হইলেন। এই সময়ে পিতা তাঁহাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন।

রামকান্ত রায় ১২১০ সালে পরলোক গমন করেন। তখন রামমোহন গৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিক দিন সুখে বাস করিতে পারিলেন না। জননী ফুলঠাকুরাণী, বিধর্ম্মী বলিয়া, পুত্রকে সম্পত্তিচ্যুত করিবার জন্য তাঁহার নামে সুপ্রীমকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। এই মোকদ্দমায় রামমোহন জয়লাভ করেন। কিন্তু বিধাতা যাঁহাকে অমূল্য ধর্ম্মধনে ধনী করিয়াছেন, পার্থিব চঞ্চল বিষয় তাঁহার মনকে কিরূপে তৃপ্তি প্রদান করিবে? সুতরাং বিষয়-সম্পত্তির ভার জননীর উপর দিয়া, তিনি কঠিন পরিশ্রম সহকারে, একাগ্রচিত্তে আবার শাস্ত্রপাঠে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার

জ্ঞানানুরাগ, শাস্ত্র-পাঠে আসক্তি ও তন্ময়ভাব সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিল। আহার, নিদ্রা ও ভোগ-বিলাসে বিগতস্পৃহ হইয়া, তিনি শাস্ত্রসমুদ্রের গভীর প্রদেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এস্থলে তাঁহার পাঠাসক্তি সম্বন্ধে দুইটী গল্প বলিতেছি। "এক দিন প্রাতঃস্নানান্তে তিনি নির্জ্জন গৃহে উপবেশন করিয়া, বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ পাঠে নিযুক্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইল না। তিনি পরিবারবর্গকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, কেহ যেন পাঠের সময়ে তাঁহাকে বিরক্ত না করে। সকলের আহার হইয়া গেল। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইল, পুত্রকে ফেলিয়া মাতা আহার করিলেন না। অপরাহ্নে এক দিনে 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' শেষ করিয়া, তিনি গৃহদ্বার খুলিলেন।"

"এক দিন একজন পণ্ডিত কোন তন্ত্র সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য রাজার নিকট উপস্থিত হন। রাজা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত পুস্তক পাঠ করেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'আপনি আগামী কল্য আসিবেন, বিচার হইবে।' অতঃপর শোভা-বাজার রাজবাটী হইতে উক্ত তন্ত্র আনিয়া পাঠ করিলেন। পর দিন ঘোরতর বিচার আরম্ভ হইল। রাজার পাণ্ডিত্য ও তর্ক-প্রণালীর নিকট পণ্ডিত মহাশয় পরাজয় স্বীকার করিলেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজসেবা।

২৪ বৎসর বয়সে রামমোহন রংপুরের কালেক্টর ডিগ্‌বী সাহেবের অধীনে কেরাণীগিরি কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি কর্ম্ম গ্রহণের সময়ে শ্রীযুক্ত ডিগ্‌বী সাহেবের নিকট লিখাইয়া লইলেন যে, তিনি যখন কার্য্যের জন্য সাহেবের নিকট উপস্থিত হইবেন, তখন তাঁহাকে আসন দিতে হইবে, এবং সামান্য আমলাদিগের প্রতি যেরূপ যখন তখন আদেশ করা হয়, তাঁহার প্রতি সেরূপ করা হইবে না। সাহেব চুক্তি-পত্রে এইরূপ স্বাক্ষর না করিলে, তেজস্বী রামমোহন এই কার্য্য কখনই গ্রহণ করিতেন না। বিদ্যাবুদ্ধি, কর্ম্ম-কুশলতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার গুণে শীঘ্রই তিনি দেওয়ানি-পদ লাভ করিলেন। ক্রমে ডিগ্‌বী ও রামমোহনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। সাহেব শিষ্যের ন্যায় রামমোহন রায়ের কোন কোন গ্রন্থ ভূমিকা সহ প্রকাশ করেন।

রামমোহন ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চাকরী করেন। তন্মধ্যে দশ বৎসর রংপুর, ভাগলপুর, রামগড় এই কয়েকটি জেলায় দেওয়ানের কার্য্যে

নিযুক্ত ছিলেন। তখন ইংরাজ-অধিকারে দেওয়ানি-পদই দেশীয়দিগের পক্ষে উচ্চতম পদ ছিল।

তিনি যে কিরূপ দক্ষতা, ন্যায়পরতা ও নিষ্ঠাসহকারে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রাজার জীবন-চরিত হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।—"তিনি ভূমির ন্যায্য রাজস্ব সুন্দররূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন। বিশেষতঃ তিনি ধূর্ত্ত ও অন্যায়পরায়ণ আমীন্ ও আমলাদিগের মিথ্যা হিসাবপত্র সহজে ধরিয়া দিতে পারিতেন বলিয়া ডিগ্‌বি সাহেব অনেক ভ্রম হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ভূমির গুণাগুণ ও প্রকৃত অধিকারী নির্ণয় সম্বন্ধে যে সকল পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সাহেবের এতদূর প্রিয়পাত্র হন যে, সাহেব কর্ম্মোপলক্ষে যেখানে যাইতেন রামমোহন রায়কে সঙ্গে লইতেন। কেবল তাহা নহে, জিলার ভূম্যধিকারিগণ রামমোহনের দ্বারা এতদূর উপকৃত হইতেন যে, কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তর গমনকালে তাঁহারা তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ব্রত-উদ্‌যাপন।

রামমোহন রায় প্রাণে যে সত্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রচার না করিয়া, নীরব থাকা, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি বিষয়-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াই, দেশে আসিয়া ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচার ও মূর্ত্তি-পূজার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। আবার চারিদিকে অত্যাচার ও নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। পুরুষ-সিংহ সেই সকল অত্যাচারের মধ্যে অচলবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া, আপনার ব্রত-উদ্‌যাপনে নিযুক্ত হইলেন। কিছুতেই তাঁহার পথে বিঘ্ন ঘটাইতে পারিল না। শত অত্যাচারেও তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও সাহস পরাভব স্বীকার করিল না। রামজয় বটব্যাল নামে এক ব্যক্তি চারি পাঁচ হাজার লোক একত্র করিয়া, এক দল গঠন করিল। ইহারা প্রভাতে রামমোহন রায়ের বাড়ীর নিকট কুক্কুট-ধ্বনি এবং সন্ধ্যাসমাগমে অন্তঃপুরে গোহাড় নিক্ষেপ করিত। অবশেষে মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া রামমোহন রায়কে বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু রাজার প্রেম ও ধৈর্য্য শত্রুকুলের সমুদয় অপ্রেম ও অত্যাচারের উপর জয়লাভ করিল।

এই সময়ে ঘরে বাহিরে রামমোহন রায়ের প্রতি নির্য্যাতন

আরম্ভ হইল। তাঁহাকে সাহায্য করিবার বা উৎসাহ দিবার কেহই রহিল না। চতুর্দ্দিকে উত্তাল তরঙ্গ, তাহার ভিতরে রামমোহন আপনার সাধন-তরী ধীরে ধীরে গন্তব্যপথে লইয়া যাইতেছেন। ফুলঠাকুরাণী রামমোহনের পত্নী ও তাঁহার নব পুত্রবধূকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার সংকল্প করিলেন। তখন রামমোহন রায়, রঘুনাথপুরে শ্মশান-ক্ষেত্রে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। বাড়ীর সম্মুখে মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া, উহার চতুর্দ্দিকে "ওঁ তৎসৎ" এবং "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই বাক্য দুইটী খোদিত করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। কোথাও যাইতে হইলে, তিনি সর্ব্বপ্রথমে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে এই মঞ্চটি প্রদক্ষিণ করিতেন।

রামমোহন রায় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে চল্লিশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া, মাণিকতলায় একখানি বাড়ী ক্রয় করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। যে ব্রত-উদ্‌যাপনের জন্য তাঁহার পৃথিবীতে আগমন, যাহার জন্য বিধাতা তাঁহাকে এতদিন ধরিয়া প্রস্তুত করিতেছিলেন, এখন সেই যুগ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনরূপ মহাব্রত উদ্‌যাপন আরম্ভ হইল। রামমোহন পাঠ্যাবস্থায় যে সত্যের আভাস পাইয়াছিলেন, যে সত্যের জন্য তাঁহাকে দুইবার পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইতে হইয়াছিল, সংস্কৃত শাস্ত্রপাঠে যাহা উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, নীরব সাধনা

দ্বারা যাহা জীবনে শক্তি, শান্তি ও অভয়দান করিতেছিল, সেই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মহা সত্য-প্রচারে তিনি দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। সমবেত বিরুদ্ধ শক্তি-নিচয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্মের' জয়-পতাকা ভাগীরথী-বক্ষে উড্ডীন করিলেন। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রোগে সুস্থতায় তিনি অবিচলিত নিষ্ঠা ও সাহসের সহিত এই পতাকা ধারণ করিয়াছেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁহার অন্য কার্য্য ছিল না—অন্য চিন্তা ছিল না।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ রামমোহনের চেষ্টায় মাণিকতলা-ভবনে "আত্মীয়-সভা" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তাহে একদিন এই সভার কার্য্য হইত। শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদপাঠ ও গোবিন্দ মালা সঙ্গীত করিতেন। এই সভা স্থাপনের পর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি হইল। তজ্জন্য জয়কৃষ্ণ সিংহ নামক এক ব্যক্তি আত্মীয়-সভার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া, বিপক্ষ-পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন যে, আত্মীয়-সভায় গোহত্যা করা হয়। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে রামমোহন অচলবৎ স্থির রহিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাসমাগমে তিনি গম্ভীরভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরীতে এক মহাসভা আহূত হয়। তাহাতে কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থান হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। আত্মীয়-সভার লোকদিগকে

পরাস্ত করিবার জন্য, কলিকাতা-সমাজের সভাপতি রাধাকান্ত দেব বড় বড় পণ্ডিতগণকে লইয়া, সভায় আগমন করেন। পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী বিপক্ষ-পক্ষের মুখপাত্র হইয়া, তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। রামমোহনকে পরাস্ত করিবার জন্য অনেক কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছিল। ঘোরতর তর্ক আরম্ভ হইল, প্রশ্নোত্তরে সভাস্থল আন্দোলিত হইতে লাগিল। পরে রামমোহন রায়ের অব্যর্থ যুক্তি, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান শাস্ত্রী মহাশয়কে নীরব করিল। আত্মীয়-সভার নিকট পৌত্তলিকগণের পরাজয়-বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। বিপক্ষগণ ক্ষোভে ও অপমানে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই বাদ প্রতিবাদের সময় আমাদের দেশের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রামমোহন রায়ের সহিত সম্মিলিত হইলেন। সকলেই যে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারের জন্য রাজার সহিত বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এমন নহে, তাঁহার সুশীলতা ও নম্রতা, বিদ্যাবুদ্ধি ও মধুর ব্যবহার অনেকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, জোড়াসাঁকোর ব্রজমোহন মজুমদার, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিতা নন্দকিশোর বসু, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ বৃন্দাবন মিত্র, স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিতামহ গোপীমোহন ঠাকুর, আন্দুলের মল্লিকবংশীয় কাশীনাথ মল্লিক, গড়পারের নিমাইচরণ মিত্র, তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, টাকীর কালীনাথ রায় এবং পণ্ডিত রঘুরাম

শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, দ্বারকানাথ মুন্সী, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি রামমোহন রায় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন আর এক ব্যক্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পর, সকলেই একে একে আত্মীয়-সভা পরিত্যাগ করিলেন; কেবল ইনিই নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সভার কার্য্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য্য ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাগুরু পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

রামমোহন রায় প্রথম এডাম্ সাহেবের "ইউনিটেরিয়ান সোসাইটী" নামক স্থানে যাইয়া, উপাসনায় যোগদান করিতেন। সেখানে একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদিগের মতানুসারে উপাসনা হইত। এক দিন তিনি উপাসনার পর সশিষ্যে বাড়ী আসিতেছিলেন, এমন সময়ে, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন, "আমাদের নিজের একটী উপাসনা-গৃহ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।" এই প্রস্তাবটি রামমোহন রায়ের মনের সহিত মিলিয়া গেল। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্যান্য কয়েক জন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া, এই সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হইলেন। জোড়াসাঁকো চিৎপুর রোডের উপর কমল বসুর বাড়ী ভাড়া লইয়া, সেখানে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই ভাদ্র তারিখে প্রকৃতরূপে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। এই দিন ভার-

তের পক্ষে এক বিশেষ গৌরবের দিন। প্রতি শনিবার সেখানে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বেদ-উপনিষদ্ পাঠ, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত হইত। এইরূপে এদেশে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল।

ইহার কিছু দিন পরে, উপযুক্ত অর্থ-সংগৃহীত হইলে, চিৎপুর রোডের পার্শ্বে বর্ত্তমান ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইল। রামমোহন রায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ঘোষণা করিলেন— "এখানে নিরাকার চিন্ময় দেবতার পূজা হইবে। এখানে কোন প্রকার মূর্ত্তি ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। কোন জীব-হিংসা হইবে না। সঙ্গীত বা বক্তৃতায় কাহার উপাস্য দেবতাকে বিদ্রূপ, ঘৃণা বা অবজ্ঞা করা হইবে না। যাহাতে জগতের একমাত্র স্রষ্টা পাতা বিধাতার ধ্যান ধারণার উন্নতি হয়; প্রেম, নীতি, ভক্তি প্রভৃতির উন্নতি হয়, এবং সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে।"

কি উদার ভাব! সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্যেই যে একেশ্বরতত্ত্ব আছে, তিনি পুস্তকে, তর্কে ও উপদেশে যে কেবল তাহা প্রমাণ করিলেন, এমন নহে, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সার্ব্বভৌমিক ভাবে পরব্রহ্মের পূজার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাই রামমোহন রায়ের জীবনের সর্ব্বোত্তম, পবিত্রতম ও মহত্তম কার্য্য।

হিন্দু, পারশিক, জর্ম্মণ, ইংরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশবাসী-

দিগকে পূর্ব্বে লোকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া মনে করিত। মোক্ষমূলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই সকল বিভিন্ন জাতির ভিতরে ভাষাগত, আকৃতিগত, আচারব্যবহারগত এমন সব মিলন-সূত্র আবিষ্কার করিলেন, যাহাতে ইহাদিগকে আর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলিয়া ভাবিতে পারা গেল না। উক্ত জাতি সকল এক মহা আর্য্য-জাতির শাখাপ্রশাখা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। যাহারা বিভিন্ন, স্বতন্ত্র ও পর ছিল, তাহারা এক মহা আত্মীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ হইল। সকলের ধমনীতে একই আর্য্যশোণিত প্রবাহিত, সকলের ভাষাতে একই মৌলিকত্ব, সকলের আকৃতিগত এক মহা সাম্য। এই জাতিগত সাম্য আবিষ্কৃত হওয়াতে, এক মহামিলনের ভূমি প্রকাশিত হইল। জাতিগত মিলনের ন্যায় রামমোহন রায় ধর্ম্ম-জগতে এক সার্ব্বভৌমিক মিলনের ভূমি আবিষ্কার করিলেন। রামমোহন রায় সাম্প্রদায়িক বিরোধের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বজ্র-গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিলেন—সকল প্রকৃত ধর্ম্মই মূলে এক। যতই দিন যাইতেছে, যতই ধর্ম্মমত ও ভাবের আদান প্রদান ও পরিচয় হইতেছে, যতই শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, ততই পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে রাজার আবিষ্কৃত এই মিলন-ভূমির দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই উদার-গতির পথ রোধ করা কাহারও সাধ্য নয়। এমন দিন আসিতেছে, যখন পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

মত ও পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া, একে অন্যকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিবে। পৃথিবীর চারিদিকে তাহার শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। মিলনের জন্য নানারূপ আয়োজন ও অনুষ্ঠান হইতেছে। এই আয়োজন যতই সফল হইবে, রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব, বিশেষত্ব ততই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। যে অনুষ্ঠানের আরম্ভ ভাগীরথী-তীরে, তাহার পরিণতি পৃথিবীব্যাপী হইবে।

বহুদেব-বাদ ও অবতার-বাদ পূর্ণ ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য রামমোহন রায়কে যেরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, যেরূপ ধৈর্য্যের সহিত বিপক্ষের মত সকল খণ্ডন করিতে হইয়াছিল, এবং সেই বাদ-প্রতিবাদে যেরূপ বিচিত্র যুক্তি-কৌশল, বুদ্ধির প্রখরতা ও অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পুস্তক প্রচার ও বিচার।

রামমোহন রায় তাঁহার সকল তর্ক ও বিচারের ভিত্তি-স্বরূপ বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করেন। ৫৫৮ সূত্র সমন্বিত বেদান্ত-ভাষ্য ১৮১৫ অব্দে মুদ্রিত হয়। ব্রহ্ম-বিচারে এই গ্রন্থ তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল। ইহাতে বেদব্যাস প্রণীত বেদান্তের ব্যাখ্যান এবং শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য থাকায়, ইহার প্রামাণ্যতা কাহারও অগ্রাহ্য করিবার উপায় ছিল না। ইহার ভূমিকায় রামমোহন ব্রহ্মপূজার বিরুদ্ধ-পক্ষের আপত্তি সকল খণ্ডন করেন। প্রথম মুদ্রাঙ্কনের অক্ষর সকল অতি পুরাতন; ছাপার অক্ষর বলিয়াই বোধ হয় না। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা-ভাষায় গদ্য-রচনার প্রচলন ছিল না বলিলেই চলে।

তিনি সমগ্র ভারতে স্বীয় মত প্রচারের জন্য বেদান্ত-ভাষ্যের হিন্দুস্থানী ও ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। নিজব্যয়ে এই সমস্ত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেন। ভবিষদ্বক্তা রাম-মোহন এই পুস্তকের ভূমিকায় বলিয়াছেন,—"আমি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, ন্যায় ও সত্যের আদেশে, যে পথ

অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে আমার প্রবল কুসংস্কারাপন্ন আত্মীয়গণের নিন্দা ও তিরস্কার-ভাজন হইয়াছি। কিন্তু ইহা যত কেন অধিক হউক না, আমি এই বিশ্বাসে ধীর ভাবে সমস্ত সহ্য করিতেছি, যে এমন এক দিন আসিবে, যখন আমার সামান্য চেষ্টাকে লোকে ন্যায় দৃষ্টিতে দেখিবেন এবং কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবেন। লোকে যাহাই কেন বলুন না, অন্ততঃ এই সুখ হইতে আমাকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারিবেন না যে, আমার মনের আকাঙ্ক্ষা সেই পুরুষের নিকট গ্রাহ্য, যিনি গোপনে দর্শন করিয়া, প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করেন।” সত্যের প্রতি কি অবিচলিত বিশ্বাস! এই বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতাই তাঁহার জীবনকে সাহসপূর্ণ ও উৎসাহময় করিয়া রাখিয়াছিল। দৃঢ়-ভিত্তির উপর তাঁহার জীবন-তরু প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই তাহা শত ঝঞ্ঝাবাতেও বিন্দুমাত্র কম্পিত বা বিচলিত হয় নাই।

বেদান্ত-সূত্র অতি বিস্তৃত গ্রন্থ। সেই জন্য তিনি ইহার সার-সংকলনপূর্ব্বক ‘বেদান্ত-সার’ নামে এক খানি গ্রন্থ বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষায় প্রকাশ করেন। রামমোহন এই গ্রন্থ দ্বারা ইউরোপে পরিচিত হন। পাদরীরা ইহা পাঠ করিয়া, বিস্মিত হন। এই গ্রন্থে নানা জটিল ও দুরূহ বিষয়ের আলোচনা আছে।

ইহার পর তিনি পাঁচ খানি উপনিষদ্ প্রকাশ করেন। রাম-

মোহন রায় ব্রহ্মপূজার শ্রেষ্ঠতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণের জন্য বিবিধ শাস্ত্র হইতে ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধার করেন।

রামমোহন রায়ের বিপক্ষে যে কেবল তাঁহার স্বদেশবাসিগণই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এমন নহে, খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণও তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের জনৈক খৃষ্টান তাঁহাদের 'সমাচার চন্দ্রিকায়' ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধে একখানি পত্র প্রকাশ করেন। রামমোহন তাহার উত্তর দেন; কিন্তু 'চন্দ্রিকায়' তাহা প্রকাশিত হয় না। পরে তিনি 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা' এই নামে উক্ত প্রতিবাদ-পত্র মুদ্রিত করেন। এইরূপে বিবাদের সূত্রপাত হয়। রাজার উত্তর সকল এমন সুযুক্তি ও কৌশলপূর্ণ যে, তাহা পাঠ করিলে, তাঁহার অপূর্ব্ব তর্কপ্রণালী ও অসাধারণ ধীরতা দেখিয়া, অবাক্ হইতে হয়। পাদরীগণের কটূক্তির উত্তরে তিনি বলিয়াছেন,—"সাধারণ ভব্যতা এ সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে; কিন্তু আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে, আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম্মসংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি; পরস্পর দুর্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই!"

খৃষ্টীয় শাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিলেন। তিনি এই সময়ে চারিখানা সুসমাচার পুস্তকই অনুবাদ করেন। রামমোহনের

বাল্যকাল হইতে অসাধারণ সত্যানুরাগ ছিল। এই সত্যানু-রাগের জন্যই তিনি ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন, এই সত্যানুরাগের জন্যই তিনি বহুভাষা শিক্ষা করিয়া, নানা-শাস্ত্র হইতে সত্যরত্ন আহরণ করেন। খৃষ্টীয় শাস্ত্র হইতে যিশুর উপদেশ সংগ্রহ করিয়া, তিনি "খৃষ্টের উপদেশ—সুখ ও শান্তিপথের নেতা" এই নামে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। ইহাতে তিনি ঈশ্বরের অলৌকিক ক্রিয়া, যীশুর রক্তে পাপীর ত্রাণ ইত্যাদি কুসংস্কারমূলক মত বর্জ্জন করেন। পাদরীরা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। প্রসিদ্ধ মার্সম্যান সাহেব প্রতিবাদ করিলেন। রামমোহন রায় উত্তর প্রকাশ করিলেন। উভয়পক্ষে বহু বাদ-প্রতিবাদ চলিল। মধ্যে রামমোহন রায় এক বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহার এই সকল পুস্তক খৃষ্টানদিগের মিশনপ্রেসে ছাপান হইত, তাঁহারা আর ছাপিতে স্বীকৃত হইলেন না। রাম-মোহন রায় সহজে পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি অক্ষরাদি প্রস্তুত করাইয়া, এক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করি-লেন। তাঁহার পুস্তক সকল ঐ ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। রামমোহন রায় গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় লিখিত মূল বাইবেল হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া, অকাট্য যুক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক দেখাইয়া দিলেন, মার্সম্যান সাহেবের কথা, তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ। মার্সম্যান সাহেব পরাজয়

স্বীকার করিলেন। এই তর্ক-যুদ্ধ সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়া গেজেটের' ইংরাজ সম্পাদক ঘোষণা করিলেন যে,—"এই বিচারে ইহাই প্রমাণিত হইল, রামমোহন রায় এদেশে এখনও তাঁহার সমতুল্য লোক প্রাপ্ত হন নাই।" এই পুস্তক সকল ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রকাশিত হয়। পাঠ করিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হন।

ইহার পর 'হরকরা' পত্রে মিঃ টাইলর সাহেব রামমোহন রায়কে আক্রমণ করেন। রামমোহন 'রামদাস' এই কল্পিত নাম গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তর প্রদান করেন। ইহাতে তিনি প্রদর্শন করেন যে, হিন্দুগণ যেমন অবতার ও বহু দেববাদী, খৃষ্টানগণও তেমনই অবতার ও ত্রিত্ববাদী। উভয় সম্প্রদায়ই মূলতঃ এক। খৃষ্টানদিগকে হিন্দুদিগের সমভূমিতে আনয়ন করায়, তাঁহারা ক্রোধে অন্ধ হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই বাদ-প্রতিবাদ সকল এমন কৌতুকপূর্ণ যে, পড়িলে যথেষ্ট আমোদ ও শিক্ষা লাভ করা যায়। এই সময়ে এডাম নামক একজন ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান, রামমোহন রায়কে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। রামমোহনের খৃষ্টীয় শাস্ত্রজ্ঞান এবং যুক্তিপ্রণালী পরিণামে এডামকেই ১৮২১ খৃষ্টাব্দে একেশ্বরবাদে দীক্ষিত করিল। ইহার পর রাজা ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে কৌতুকপূর্ণ এক পুস্তিকা প্রচার করেন। এডামের মত পরিবর্ত্তনে কেহ

কেহ শ্লেষবাক্যে বলিতে লাগিলেন—"আদি পিতা এডাম শয়তানের প্ররোচনায় স্বর্গচ্যুত হইয়াছিলেন, আর এখন দ্বিতীয় এডাম রামমোহন রায়ের দ্বারা সত্যচ্যুত হইলেন!"

এইরূপে একদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্য দিকে খৃষ্টীয় পাদরীদিগের সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, তেজস্বী রামমোহন সকল দিকে বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত করিলেন। সমুদয় কার্য্য তাঁহাকে একাকী করিতে হইয়াছে। ইহাতে কত পরিশ্রম, কত ত্যাগস্বীকার, কত ধৈর্য্যের প্রয়োজন হইয়াছিল, চিন্তা করিলে মনপ্রাণ বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হয়! পুরুষ-সিংহ রামমোহন তাঁহার ব্রত-উদ্‌যাপনে যে মহতী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা কোথায় পাইব? সেই বিরাট পুরুষের সংগ্রাম-মূর্ত্তি যেন আমাদের মানস-পটে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।—"তিনি একা শত সহস্র শত্রু-দ্বারা পরিবৃত হইয়া, কুঠার হস্তে সেই ঘোর অবিদ্যারণ্য সমভূম করিয়া, দেশোদ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অবশেষে ব্রাহ্মসমাজরূপ বীজ বপন করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংসারের মধ্যে আনয়ন করিলেন। তাঁহার প্রখর জ্ঞানাস্ত্রে কুসংস্কাররূপ অরণ্য ছিন্ন ভিন্ন হইল, তাঁহারই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক তাহাতে প্রবিষ্ট হইল।" *

---

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উক্তি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সমাজ-সংস্কার।

অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুসমাজে সতীদাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। আকবর প্রভৃতি কোন কোন মুসলমান সম্রাট্ ইহা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময় হইতে এদিকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট সতীদাহ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। তখন লর্ড মিণ্টো ভারতের গবর্ণর জেনারেল।

ক্রমে এই প্রথার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে আন্দোলন আরম্ভ হইল। মার্কুইস অব হেষ্টিংসের রাজত্বকালে সতীদাহের যে তালিকা সংগ্রহ করা হয়, তাহা ইংলণ্ডে প্রকাশিত হওয়ায়, ইংলণ্ডের জনসাধারণ এই নৃসংশ প্রথা নিবারণের আবশ্যকতা অনুভব করেন।

পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট সতীদাহ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে সতীদাহের পক্ষপাতীদল এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। রামমোহন রায় যৌবনকালে কোন স্ত্রীলোকের সহমরণ ব্যাপারে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত না উক্ত প্রথা রহিত

হয়, তত দিন তিনি তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। উপদেশ, পুস্তক-প্রচার, গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান, ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে তিনি দেশ হইতে নারীহত্যারূপ মহাপাতক বিদূরিত করিবার জন্য যত্নশীল ছিলেন। এক্ষণে উক্ত আবেদনের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ও এক আবেদন প্রেরণ করিলেন। ইহাতে তিনি সতী-দাহ নিবারণের জন্য রাজবিধির প্রয়োজনীয়তা বিশেষ-ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় সতীদাহের বিরুদ্ধে তিনখানা পুস্তক প্রচার করেন। "প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের প্রথম সংবাদ", "প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ" নামক পুস্তকদ্বয় কথোপকথনের ভাষায় লিখিয়া, উহার ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংস্করণ নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া, সর্ব্বত্র বিতরণ করেন। "বিপ্রণাম ও মুগ্ধবোধচ্ছাত্র" নামধেয় পুস্তক ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। উক্ত পুস্তকত্রয়ের সার মর্ম্ম সংগ্রহ পূর্ব্বক রামমোহন ইংরাজী-ভাষায় একখানি পুস্তক প্রচার করেন। এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে ঝড় বহিতে লাগিল। রামমোহন রায়ের অকাট্য যুক্তি ও বিচারপ্রণালীর নিকট অবশেষে সকলকেই পরাভূত হইতে হইল।

রাজা যে কেবল এ সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াই আপনার কর্ত্তব্য

শেষ করিয়াছিলেন, এমন নহে, তিনি গঙ্গাতীরে যাইয়া, সতীদিগকে চিতানল হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিতেন। তিনি গবর্ণর জেনারেলের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার বক্তব্য জ্ঞাপন করিলেন। সতীদাহ সম্বন্ধীয় কোন কোন পুস্তক রামমোহন রায় মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংসের পত্নীর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই সময়ে 'ইণ্ডিয়া গেজেট' তাঁহার সম্বন্ধে বলেন ;—"এদেশীয় একজন বিশ্বপ্রেমিক মহোদয় (রামমোহন রায়) অনেক দিন হইতে রাজপুরুষগণের সহায় ও মানবজাতির হিতৈষিরূপে সতীদাহ-প্রথা নিবারণের পক্ষে নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি উৎসাহ সহকারে এ বিষয়ে তাঁহার মতামত বড়লাট সাহেবের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। অল্পদিন হইল, তিনি গবর্ণর জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, লাট-বাহাদুর আগ্রহের সহিত তাঁহার বক্তব্য শ্রবণ করেন। আমরা জ্ঞাত হইলাম বড়লাট-বাহাদুর তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তিনি এই প্রথা রহিত করিবেন।"

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। রামমোহন রায়ের পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য বড়লাট বাহাদুর তাঁহার এডিকংকে পাঠাইয়া দিলেন। রামমোহন রায় এডিকংকে বলিলেন, "আমি এখন বিষয়-কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইয়া, শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছি, আপনি দয়া

করিয়া লাট বাহাদুরকে বলিবেন, আমার রাজ-দরবারে উপস্থিত হওয়ার অবকাশ ও ইচ্ছা নাই।” এডিকং রামমোহন রায়ের বক্তব্য লাট সাহেবকে জানাইলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন?” তদুত্তরে এডিকং বলিলেন, “আমি বলিয়াছিলাম—গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সহিত একবার দেখা করিলে, তিনি অত্যন্ত বাধিত হইবেন।” এই কথা শুনিয়া সদাশয় বেন্টিঙ্ক বাহাদুর এডিকংকে বলিলেন, “আপনি আবার রামমোহন রায়ের নিকট গমন করিয়া বলুন যে, ‘আপনি দয়া করিয়া মিষ্টার উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি অত্যন্ত বাধিত হইবেন’।” এডিকং পুনরায় রামমোহন রায়ের নিকট গমন করিয়া, ঐরূপ বলিলেন। রামমোহন রায় লাট সাহেবের প্রবল আগ্রহ ও ভদ্রতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সাক্ষাতের ফলেই সতীদাহের চিতানল চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইল।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে আইনদ্বারা সতীদাহ-প্রথা নিবারিত হইল। ইহাতে হিন্দু-সমাজে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সতীদাহের পক্ষপাতিগণ রাজার উপর খড়্গহস্ত হইলেন। রাজাকে এজন্য সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া চলিতে হইত। তিনি তরুণ-বয়সে ভাগীরথী-তীরে দণ্ডায়মান হইয়া, যে নিষ্ঠুর-প্রথা

রহিত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা আজ পূর্ণ হইল। তিব্বতীয় রমণীগণের নিকট উপকার ও সহৃদয়তা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি সমগ্র নারী-জাতির প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন, আজ সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে পারিয়া, রামমোহনের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এই ঘটনায় ধর্ম্মসভা রোষে, ক্ষোভে ও বিদ্বেষে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। রামমোহন রায় সমাজ ও আত্মীয়চ্যুত হইলেন। তাঁহার নামে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচিত হইল, চারিদিক হইতে গালি বর্ষিত হইতে লাগিল। সত্যের জন্য, দেশের জন্য রামমোহন রায় কি নির্য্যাতনই না সহ্য করিলেন! কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য মহত্ত্ব। তিনি উদ্যোগী হইয়া এই সময়ে, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে যে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন, তাহার শেষভাগে বলিয়াছেন,—"যাঁহারা আপনার প্রদত্ত অনুগ্রহ আমাদের সহিত সমভাবে লাভ করিয়াছেন, অথচ অজ্ঞতা বা কুসংস্কারবশতঃ কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনে আমাদের সহিত যোগদান করেন নাই, আপনি তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবেন।"

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুলাই তারিখে রামমোহন রায় টাউনহলে এক সভা করিয়া, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে সতী-দাহ নিবারণের জন্য এই অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। তিনশত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ইহাতে স্বাক্ষর করেন। টাকীর

কালীনাথ রায় বাঙ্গালা, ও হরিহর দত্ত ইংরাজী-ভাষায় অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকীর কালীনাথ রায়, তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। বড়লাট বাহাদুর ইহার একটী সুন্দর উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

অপর পক্ষে ধর্ম্মসভা এদেশে অকৃতকার্য্য হইয়া, এই আইন রহিত করিবার জন্য বিলাতে আপীল করিলেন। এই আপীল যাহাতে সফল না হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করাও রামমোহনের বিলাত গমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এই আপীল শুনানীর সময়ে বিলাতে উপস্থিত ছিলেন। যখন ধর্ম্ম-সভার আপীল ব্যর্থ হইল, তখন না জানি রাজার কি আনন্দই হইয়াছিল।

রামমোহন রায় যে সকল ইউরোপীয় বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ডেভিড্ হেয়ার এক জন। মহাত্মা হেয়ার রামমোহনের সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যের পরম সহায় ছিলেন। রামমোহনের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নানা ঘটনায় প্রকাশ পাইত।

সহৃদয় রামমোহন যে কেবল সতীদাহ নিবারণের জন্য আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন, এমন নহে, তাঁহার হৃদয় বহুবিবাহরূপ কুপ্রথার জন্যও ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় এই প্রথা নিবারণের জন্য

রাজ-শক্তির আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

তৎপরে আমাদের দেশের নারীগণের দায়াধিকার সম্বন্ধে যে অন্যায় ব্যবস্থা দেখা যায়, রাজা তাহার বিরুদ্ধেও সতেজে লেখনী চালনা করেন। এ সম্বন্ধে যে তিনি কেবল যুক্তিই অবলম্বন করিয়াছিলেন, এমন নয়, শাস্ত্রীয় অকাট্য প্রমাণ দ্বারা আপনার মত সমর্থন করিয়াছিলেন। রাজা এই প্রসঙ্গে ইহাও প্রদর্শন করেন যে, ইউরোপীয় দায়ভাগ অপেক্ষা প্রাচীন হিন্দু-শাস্ত্রের ব্যবস্থা সকল যেমন অধিকতর ন্যায়সঙ্গত, তেমনই সমীচীন।

যে পণ-গ্রহণ-প্রথা বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজের বক্ষে পৈশাচিক নৃত্য করিতেছে, যাঁহার নিষ্ঠুর প্রতাপে মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক দয়া, মায়া, আত্মীয়তা প্রভৃতি কোমল ভাব ও সম্বন্ধ সকল বিনষ্ট-প্রায় হইয়াছে, রামমোহন রায় সেই প্রথা-নিবারণের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্র হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, প্রদর্শন করেন যে, পণ-গ্রহণ-প্রথা হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

আমাদের সমাজের এমন কোন্ কুপ্রথা আছে, যাহার বিরুদ্ধে রাজা সমর-ঘোষণা করেন নাই? যে জাতিভেদ-প্রথা ভারতের পরাধীনতার কারণ, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির অন্তরায়, এবং প্রেমের শত্রু, রামমোহন রায় সেই মহা অনিষ্টকর

প্রথা-সম্বন্ধে কি নীরব থাকিতে পারেন? তিনি 'বজ্র-সূচি' গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া, বজ্র-নিনাদে ঘোষণা করিলেন—জাতিভেদ-প্রথা যেমন ন্যায়বিরুদ্ধ, তেমনই অযৌক্তিক। এ সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ।
বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

জন্মে সকলেই শূদ্র হয়, উপনয়নাদি হইলে দ্বিজ হয়, বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র, আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ—অন্য কেহ নহে। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াও লোকে শূদ্র হইতে পারে, অথবা শূদ্র-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও কর্ম্মগুণে ব্রাহ্মণ হইতে পারে। অতএব ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বংশগত নয়, গুণগত। গুণ ও কর্ম্মের তারতম্যানুসারেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের প্রভেদ হওয়া উচিত।

এরূপ শুনা যায়, রামমোহন রায় বালবিধবার পুনর্বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিলাতে গেলে, জনরব উঠিয়াছিল যে, দেশে ফিরিয়া আসিয়া, বিধবা-বিবাহ-প্রচারে প্রবৃত্ত হইবেন।

সমাজের পক্ষে যাহা কিছু অকল্যাণকর, রামমোহন রায় তাহারই বিরুদ্ধে যেমন রণভেরী বাজাইয়াছিলেন, সেইরূপ, যাহা কল্যাণকর, তাহা প্রতিষ্ঠার জন্যও, আপনার দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি অগ্রদূতরূপে আবির্ভূত

হইয়া, সমুদায় শুভ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে সকল কুসংস্কার বিনাশের জন্য ভারতের সংস্কারকগণ চেষ্টা করিতেছেন, রামমোহন তাঁহাদের সকলেরই পথ-প্রদর্শক।

নবম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজী শিক্ষা, বেদ-বিদ্যালয় ও বাঙ্গালা গদ্য-প্রচলন।

যে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ভারতে নবজীবনের সঞ্চার হইতেছে, রাজাই তাহার প্রবর্ত্তক। একই সূর্য্যের কিরণ যেমন জগতের সমস্ত বর্ণ উৎপন্ন করিয়া, পৃথিবীকে নব নব শোভায় শোভিত করে, তেমনই রাজার হৃদয়ের গভীর স্বদেশ-হিতৈষণা ভারতের সকল কল্যাণকর অনুষ্ঠানরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই অনুষ্ঠান সকল যতই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতেছে, ততই ভারতের নানা বিভাগে কল্যাণ-শ্রী ফুটিয়া উঠিতেছে। কি সমাজ, কি শিক্ষা, কি ধর্ম্ম, কি রাজনীতি—এমন কোন বিষয় নাই, রাজার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা যাহার উন্নতিসাধনে নিয়োজিত হয় নাই। ভারতের নব বসন্তের তিনিই কোকিল। ঘোরতর শীতের মধ্যে যেমন কোকিল বসন্তের আগমনী গান করে, তেমনই রামমোহন রায় সেই অন্ধকারময় সময়ে ভারতের নব বসন্তের আভাস দিয়া গিয়াছেন। স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত এই জন্যই ভারতের এ যুগের নাম রাখিয়াছেন—"রামমোহন রায় যুগ।"

যখন লর্ড আমহর্ষ্ট এ দেশের গবর্ণর জেনারেল, তখন শিক্ষা সম্বন্ধে দুইটী দলের অভ্যুদয় হয়। একদল ইংরাজী শিক্ষার

পক্ষে, অন্য দল সংস্কৃত শিক্ষার দিকে। রামমোহন রায় ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে দেখিলেন, ইংরাজী শিক্ষা ভিন্ন ভারতের জড়ভাব দূরীভূত ও বদ্ধমূল কুসংস্কার উন্মূলিত হইবে না। সুতরাং তিনি ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে যোগদান করিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে লর্ড আমহর্ষ্টকে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে একখানি পত্র লেখেন। ইহার ভাব, ভাষা ও অপূর্ব্ব যুক্তিকৌশল দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন, এবং অনেকেই ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন। বার বৎসর ঘোরতর বাদানুবাদের পর ইংরাজী পক্ষেরই জয় হইল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইল—এদেশে ইংরাজী শিক্ষারই বিস্তার করা হইবে। রামমোহন রায়, হেয়ার্ ও ইষ্ট সাহেব—এই তিনজনে মিলিত হইয়া, হিন্দু-কলেজ স্থাপন করিলেন। হিন্দুকলেজ স্থাপনের জন্য যে কমিটী হইয়াছিল, তাহাতে রামমোহন রায় একজন সভ্য ছিলেন। কেহ কেহ রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তখন তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে কমিটী হইতে আপনার নাম তুলিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন,—"আমি কমিটীতে থাকিলে, যদি হিন্দুকলেজের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়, তাহা হইলে আমি সে সম্মানের প্রয়াসী নই।" কি উদারতা! কি নিস্বার্থতা!

বিখ্যাত খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক সদাশয় ডফ্ সাহেব ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এদেশে আগমন করিলেন। তিনি বালকদিগকে ইংরাজী

শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়া এ সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের সাহায্য ও পরামর্শ চাহিলেন। রামমোহন এই প্রস্তাবে আনন্দিত হইয়া, বিদ্যালয়ের জন্য ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ ব্যবহার করিতে দিলেন। ইহার জন্য ছাত্র সংগ্রহ করিলেন এবং কিছুকাল ইহার তত্ত্বাবধান করিলেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাপূর্ব্বক এই বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইত এবং ছাত্রগণকে বাইবেল্ পড়িতে হইত। প্রথম দিন ছাত্রগণ বাইবেল্ পাঠে আপত্তি করায়, রামমোহন রায় তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—"বাইবেল্ পড়িলেই খৃষ্টান হয় না, আমি সমগ্র বাইবেল্ পাঠ করিয়াছি, কোরাণ পড়িয়াছি—অথচ খৃষ্টান কি মুসলমান হই নাই। আবার উইলসন্ প্রভৃতি খৃষ্টভক্তগণ সংস্কৃত পড়িয়াছেন, অথচ তাঁহারা হিন্দু হন নাই। তোমাদিগকে বলপূর্ব্বক কেহই খৃষ্টান করিবে না। বিচার করিয়া সত্য গ্রহণ করিবে।" তাঁহার কথায় ছাত্রগণ বাইবেল্ পাঠে সম্মত হইল। যদি রামমোহন রায় এইরূপে ডফ্ সাহেবকে সাহায্য না করিতেন, তবে তাঁহার মহৎকার্য্য কখনই সফল হইত না। এজন্য ডফ্ সাহেব আজীবন রাজার কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। ডফ্ সাহেব বেথুন সভায় একবার বলিয়াছিলেন,—"আমি ভারতবর্ষে আসিয়া, আমার কর্ম্মক্ষেত্রে রামমোহন রায়কে যেরূপ সাহায্য-কারী, হিতৈষী বন্ধুরূপে পাইয়াছিলাম, দেশীয়, কি ইউরোপীয়, অন্য কাহাকেও সেরূপ পাই নাই।"

রামমোহন রায় ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে কেবল অন্যকে সাহায্য ও গবর্ণমেণ্টকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি নিজব্যয়ে একটী ইংরাজী বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক ভদ্র-বংশীয় বালক এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ে পড়িতেন। তিনি বলিয়াছেন,—"রাজা নিজের গাড়ীতে করিয়া, আমাকে লইয়া গিয়া, তাঁহার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। রাজার সঙ্গে যাইবার সময়ে আমি বিমুগ্ধ চিত্তে তাঁহার গম্ভীর সুন্দর অথচ ঈষৎ বিষাদ-মিশ্রিত মুখশ্রী দেখিতে দেখিতে স্কুলে গিয়াছিলাম।" এই বিদ্যালয়ে ৬০ জন বালক পাঠ করিত।

রামমোহন রায় বেদ-শিক্ষা প্রদানের জন্য মাণিকতলা ষ্ট্রীটের ৭৪নং বাড়ীতে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে সাহায্য প্রদানের জন্য তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সে সময়ে গভর্ণমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু মহাপুরুষেরা নিজের বুদ্ধিতে কিছুই করেন না, বা বলেন না। তাঁহাদের সমুদায় কার্য্য ঈশ্বর-প্রেরণা হইতে উৎপন্ন। সুতরাং সকলকেই পরিণামে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে হয়। ৭০ বৎসর পরে বঙ্গের ছোটলাট স্যর চার্লস ইলিয়ট ও শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ ক্রফট্ সাহেবের ব্যবস্থানুসারে রাজার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

রামমোহন রায় লোক-শিক্ষার জন্য আরও অনেক উপায় অবলম্বন করেন। জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তার ভিন্ন কখন দেশের উন্নতি হইতে পারে না। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, দেশীয় ভাষার উন্নতির প্রয়োজন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের অত্যন্ত দুরবস্থা ছিল। এ বিষয়েও তাঁহাকে একরূপ পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিতে হইয়াছিল, বলিতে হইবে। গদ্যের নিয়মপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়া, তবে তাঁহাকে গদ্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। সর্ব্ববিধ সংস্কারক রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষা এবং সংস্কৃতেরও উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুনিপুণ কর-স্পর্শে বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য নব-শ্রী ধারণ করিয়াছে। সেই সময়ে তাঁহার লিখিত গদ্যই উৎকৃষ্ট গদ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই অপরিণত বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে গভীর শাস্ত্রবিচার, কঠোর তর্কবিতর্ক করিতে যাইয়া, তাঁহাকে পদে পদে কতই না অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পুরুষসিংহ কিছুতেই পশ্চাৎপদ বা ভগ্ন-মনোরথ হন নাই। বর্ত্তমান উৎকৃষ্ট গদ্য-রচনার ভিত্তি তিনিই স্থাপন করেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"রামমোহন রায়ের রচিত যে কয়খানা বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ই শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ এবং পৌত্তলিকতা-

বলম্বী প্রাচীন ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সহিত বিচার। এ সকল গ্রন্থে তিনি নিজে নানা শাস্ত্রবিষয়ক প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধি, তর্কশক্তি, শাস্ত্রের সারগ্রাহিতা, বিনয়, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিবিষ্ট-চিত্তে সেই সকল অধ্যয়ন করিলে, চমৎকৃত ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে হয়।”

রামমোহন রায় ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বিদেশীয়দিগের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্য ইংরাজী ভাষায় এক বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। পরে তাহা বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। ইহা স্কুল বুক সোসাইটী কর্ত্তৃক চতুর্থবার মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণে “কমা”, “সেমিকোলন” প্রভৃতি ছেদ-চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার সঙ্গীত-পুস্তকেও এরূপ চিহ্ন দেখা যায়। তিনি বাঙ্গালায় এইরূপ ছেদ-চিহ্নেরও প্রবর্ত্তক।

রাজা সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলির ভিতরে গভীর ঈশ্বরানুরাগ ও বৈরাগ্য নিহিত রহিয়াছে। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন,—“রামমোহন রায় উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত বোধ হয়, পাষাণকেও আর্দ্র, পাষণ্ডকেও ঈশ্বরানুরক্ত ও বিষয়-নিমগ্ন চিত্তকেও উদাসীন করিয়া তুলিতে পারে। ঐ সঙ্গীত যেমন প্রগাঢ় ভাব-

পূর্ণ, সেইরূপ বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী সমন্বিত। কলাবতেরা উহা সমাদর পূর্ব্বক গাহিয়া থাকেন।"

রামমোহন রায় ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 'সংবাদ-কৌমুদী' নামক একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে ইতিহাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইত। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা-ভাষায় ঐ শ্রেণীর পত্রিকা আর প্রকাশিত হয় নাই। তিনি একখানা ভূগোল লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার নাম ভূগোল ছিল না—ইংরাজী জিওগ্রাফী শব্দের অনুকরণে—জ্যাগ্রাফী রাখা হইয়াছিল। জ্যা শব্দের অর্থ ভূ পৃথিবী। তিনি খগোল, ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রভৃতি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাজনীতি-চর্চ্চা।

রামমোহন রায় রাজা ও প্রজার কল্যাণের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের রাজনীতিজ্ঞগণ যে যে বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, বহুপূর্ব্বে রামমোহন তাহার সূচনা করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তিনি এদেশবাসিগণের পথ-প্রদর্শক।

রামমোহন রায় রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় দুই খানা সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। বাঙ্গালা খানার নাম 'সংবাদ-কৌমুদী।' এই পত্র একদিকে যেমন শিক্ষার বিস্তার করিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি জন-সাধারণকে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল।

যাহাতে এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য তিনি আন্দোলন উপস্থিত করেন। গবর্ণর জেনারেলের নিকট এ সম্বন্ধে যে সুযুক্তিপূর্ণ আবেদন পত্র প্রেরিত হয়, রামমোহনই তাহার রচয়িতা। তিনি এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়াতে, অনেক উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ইংরাজ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন।

'কলিকাতা জার্ণেল' নামক সংবাদ-পত্রের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বকিংহাম সাহেব গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া, তদানীন্তন প্রতিনিধি গবর্ণর জেনারেল এডাম্ সাহেব কর্তৃক এ দেশ হইতে তাড়িত হন। স্বাধীনতা-প্রিয় রামমোহন রায় এই ঘটনায় দুঃখিত হইয়া, ইংলণ্ডাধিপতি চতুর্থ জর্জের নিকট ইহার প্রতিকার-প্রার্থী হইয়া, একখানা আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। উহাতে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল।

এই সময় সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক একটী দায়াধিকার ঘটিত মোকদ্দমায় এই নিষ্পত্তি হয় যে, পুত্র বা পৌত্রের মত গ্রহণ না করিয়া, কোন ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তি দান-বিক্রয় করিতে পারিবেন না। এই ব্যবস্থায় হিন্দুগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। রামমোহন রায় ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন, এবং এ সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একখানা পুস্তক প্রকাশ করেন। কেবল তাহাই নহে, হিন্দু সমাজের মুখপাত্র হইয়া, এই নিষ্পত্তি রহিত করিবার জন্য তিনি বিলাতে আপীল করেন। তাঁহার আপীল নিষ্ফল হয় নাই,—প্রিভি-কাউন্সিল, সুপ্রীমকোর্টের আদেশ রহিত করেন।

বঙ্গদেশের ন্যায় যাহাতে ভারতের সর্ব্বত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, রাজা তজ্জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের সহিত যেমন

জমিদারদিগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবে, সেইরূপ প্রজাগণের সহিতও জমিদারদিগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া প্রয়োজন। রামমোহন রায়ের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য হইলে, জমিদারগণ যথেচ্ছভাবে প্রজাগণের খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিতেন না।

ইতর শ্রেণীর ইংরাজগণ এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলে কি ক্ষতি হইবে, রাজা তাহা প্রদর্শন করেন। তবে সুশিক্ষিত ও ধনশালী ইংরাজগণ এখানে আসিয়া বাস করিলে, দেশের অনেক টাকা দেশেই থাকিয়া যাইতে পারে। মুসলমান রাজত্বে আমাদের দেশের অর্থ দেশেই থাকিয়া যাইত। ইংরাজের শাসন-গুণে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের শোষণের ফলে এদেশ ক্রমশঃ দীন হইতে দীনতর হইয়া পড়িতেছে। এদেশের লোক বিদেশে যাইয়া, উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, অর্থাদি উপার্জ্জন করে, ইহাও রাজার একান্ত অভিলাষ ছিল।

যাঁহাদের হাতে রাজবিধি-প্রণয়নের ভার থাকিবে, তাঁহারা প্রজাবৃন্দের নিয়োজিত প্রতিনিধি হইবেন, রাজা এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রতিনিধি-মূলক শাসন-প্রণালীই স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তি।

আমাদের জাতীয় মহাসমিতি 'শাসন ও বিচার বিভাগ' পৃথক করিবার জন্য বহু দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা এই কল্যাণকর প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া

গিয়াছেন। শাসন ও বিচার বিভাগের অপবিত্র সম্মিলন হইতে, দেশে শত শত বিচার-বিভ্রাট, শত শত দুর্ব্বল ব্যক্তির উপর নির্য্যাতন হইতেছে। অনেক প্রধান প্রধান ইংরাজও এই অশুভ সংযোগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এতদিন পরে গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী জেলায়—শাসন ও বিচার-বিভাগ পৃথক্ করিয়া, তাহার উপকারিতা পরীক্ষা করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। রাজা বলিয়াছেন,—"যদি আইন-প্রণয়ন-বিভাগ, রাজ্যশাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ পৃথক্ থাকে, এবং ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যগণ প্রজাগণ কর্ত্তৃক মনোনীত হন, তাহা হইলেই উৎকৃষ্টরূপে রাজ্যশাসন-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।"

পূর্ব্বে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে ভারতের শাসন-ভার ন্যস্ত ছিল, তখন উক্ত কোম্পানির উপর পার্লেমেণ্ট মহাসভার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ছিল। এই কর্ত্তৃত্ব ছিল বলিয়াই, কোম্পানিকে অতি সতর্কতার সহিত ভারতের শাসন-দণ্ড পরি-চালনা করিতে হইত। ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে এই জন্যই পার্লেমেণ্ট সভার বিচারাধীন হইতে হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে, মহাসভার সেই কর্ত্তৃত্ব ও শাসন-ক্ষমতা নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে; কাজেই ভারতের শাসন-কর্ত্তাগণ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পাইয়া, যথেচ্ছা-চারী হইয়া উঠিতেছেন। ইহার দ্বারা প্রজাগণ যেমন উৎ-

পীড়িত হইতেছে, সেইরূপ, প্রজাগণের হৃদয় হইতে রাজভক্তি চলিয়া যাইতেছে, এবং ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িতেছে। রাজাও, প্রজাগণের রাজভক্তিহীনতা দেখিয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন। রামমোহন রায়ের দৃষ্টি এদিকেও পতিত হইয়াছিল। রাজা ও প্রজা উভয়ের কল্যাণকামী হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপরে পার্লেমেণ্টের শাসন থাকা আবশ্যক।" তিনি ইহার পক্ষে অনেক যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাহাতে ভারত-গবর্ণমেণ্টের উপর পার্লেমেণ্টের কর্তৃত্ব থাকে, তজ্জন্য কি এদেশীয়, কি ইংলণ্ডবাসী সমস্ত ভারত-হিতৈষীই চেষ্টা করিতেছেন। এখন ভারত-সচিব ও বড়লাটই আমাদের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। মহাসভার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়!

ভারতের শাসন-কার্য্যে যাহাতে ইংরাজ জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, রামমোহন রায় ইংলণ্ডে যাইয়া, তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ভারতীয় লোকের কি কি অভাব ও কষ্ট আছে, এবং তাহা নিবারণের উপায় কি, তিনি সে সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য পুস্তকাকারে ইংলণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়া, ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া আমাদের দেশের এক শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞগণ, এখন ভারতের অভাব ও অভিযোগের দিকে ইংলণ্ডের জনসাধারণের

দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। রামমোহন রায় অনেক পূর্ব্বে ইংলণ্ডে বাসকালে এজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি পুস্তক প্রচার, প্রধান প্রধান লোকের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ, এবং অনেকের সহিত পত্রাদির আদান প্রদান করিয়াছিলেন।

আইন-প্রণয়ন সম্বন্ধে রামমোহন রায় বলেন,—"আইন-প্রণয়নের পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে প্রজার মত গ্রহণ করা উচিত। প্রজার মনের ভাবের প্রতি প্রজাহিতৈষী রাজার শ্রদ্ধা থাকা উচিত।" রাজপুরুষগণ এই সুনীতি বিস্মৃত হইয়া, দেশে কত বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতেছেন।

আদালত সম্বন্ধে রাজা বলিতেছেন,—"সুপ্রীমকোর্ট গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকা উচিত নহে। সুপ্রীমকোর্ট যদি গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিত অনুসারে চলেন, তবে দেশে ন্যায়-বিচারের আশা কোথায়? এই সুপ্রীমকোর্টই কালে হাই-কোর্টে পরিণত হইয়াছে।

জুরি-প্রথা সম্বন্ধে রাজার মত এই যে, "ভারতবর্ষে প্রাচীন-কালে পঞ্চায়ত দ্বারা বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। তাহা রহিত না করিয়া, সেই পঞ্চায়তী-প্রথা, জুরির আকারে পরি-বর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বাধীনতা।

রামমোহন রায়ের হৃদয়ে যে আশ্চর্য্য স্বাধীন ভাব ছিল, স্বাধীনতার প্রতি তাঁহার যে ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এ সম্বন্ধে তাঁহার উদার হৃদয়ে স্বদেশ বিদেশে কোন ভেদ ছিল না। কোন দেশ ন্যায় ও স্বাধীনতার সমরে জয়লাভ করিয়াছে শুনিলে, রামমোহন রায় আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে স্পেনদেশে নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত হইল। কোথায় স্পেন, আর কোথায় বঙ্গদেশ! রামমোহন রায় এই প্রিয় সংবাদ পাইয়া, আনন্দে অধীর হইয়া, নিজব্যয়ে টাউনহলে এক প্রকাশ্য ভোজের আয়োজন করিলেন। পর্ত্তুগাল নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী লাভ করিল, তাঁহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। গ্রীকেরা তুরস্কদিগের অধীনতা ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার জন্য সমর ঘোষণা করিল, রামমোহন রায় ঠিক এক জন গ্রীকের ন্যায় সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রীসের জয় কামনা করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় সংবাদ আসিল, নেপল্‌স্‌-বাসিগণ স্বাধীনতার যুদ্ধে পরাজিত হইতেছেন; তাঁহার মন অবসন্ন হইয়া পড়িল,—সকল স্ফূর্ত্তি, সকল আমোদ অন্তর্হিত হইল! গাঢ় অন্ধকারে তাঁহার

বদনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল! সেইদিন মিঃ বকল্যাণ্ড্ নামক একজন ইংরাজের সহিত তাঁহার দেখা করিবার কথা ছিল; এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ে এমনই আঘাত লাগিয়াছিল যে, সাহেবের সহিত দেখা করিতে তিনি সমর্থ হইলেন না। পত্রের দ্বারা তাঁহাকে মনের ভাব জানাইলেন। কি স্বাধীনতা! কি বিশ্বজনীন প্রেম! কি আশ্চর্য্য মহত্ত্ব!

রোমান ক্যাথলিকগণ পূর্ব্বে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় প্রবেশ, কি গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন কর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিতেন না। এই অন্যায় আইন রহিত হইলে, রামমোহন রায় অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রাজা ইংলণ্ডে যাইতে যাইতে, পথিমধ্যে নেটালের বন্দরে শুনিতে পাইলেন যে, স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা বক্ষে ধারণ করিয়া, একখানা ফরাসী জাহাজ যাইতেছে। শুনিবামাত্র রামমোহনের হৃদয় উল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। প্রাণের আবেগে, ব্যস্তভাবে সেই পতাকাকে অভিবাদন করিতে যাইয়া, তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া গেল! ফ্রান্স তাঁহার জন্মভূমি নয়, সেখানে তাঁহার কোন আত্মীয় নাই, অথচ রাজার হৃদয় ফরাসীর স্বাধীনতা-পতাকা দর্শন ও অভিবাদন করিবার জন্য এত ব্যাকুল! পরাধীন দীনহীন দেশে রামমোহন কি স্বাধীন-আত্মা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! যিনি বিদেশীয় শাসনের প্রতি ঘৃণাবশতঃ ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে,

ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন-দেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন; কুসংস্কারের দৃঢ়বন্ধন যাঁহার আত্মাকে কখনও বন্ধন করিতে পারে নাই; তিনি যে স্বাধীনতার প্রতি এতদূর সম্মান প্রদর্শন করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

রাজা যখন ইংলণ্ডে, তখন "রিফরম্ বিল" লইয়া সেখানে বিভিন্ন দলে বিরোধ উপস্থিত হয়। রাজা একখানি পত্রে তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন,—"এই বিরোধ কেবল সংস্কারক ও সংস্কার-বিরোধীদিগের মধ্যে নহে, স্বাধীনতা ও পরাধীনতার পৃথিবীব্যাপী বিরোধ—ইহা ন্যায় ও অন্যায় এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিরোধ। অতীতের ইতিহাস উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, অত্যাচারী শাসনকর্ত্তৃগণ অন্যায়পূর্ব্বক বাধাপ্রদান করিলেও ধর্ম্ম ও রাজনীতির উদারমত সকল ক্রমে ক্রমে অথচ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে।" যাহাতে এই বিল পাশ হয়, তাহার জন্য তাঁহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং পাশ হইলে পর তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন,—"আমি প্রকাশ্য-রূপে ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে, 'রিফরম্ বিল' পাশ না হইলে, আমি এ দেশ ত্যাগ করিব।" যে দেশে ন্যায়ের সম্মান নাই, সত্যের আদর নাই, সেই দেশ স্বাধীন হইলেও তাহা রামমোহন রায়ের নিকট কারাগার বলিয়া মনে হইত। এই জন্য তিনি বাল্যকালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং

শেষজীবনে 'রিফরম্ বিল' পাশ না হইলে, সেই মুহূর্ত্তে ইংলণ্ড ত্যাগ করিবেন বলিয়া, সংকল্প করিয়াছিলেন।

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রাজার আশা ও মত কি ছিল, তাহা জানা দরকার। যে ঔপনিবেশিক শাসন-প্রণালী লাভের জন্য, ভারতবর্ষে নব উদ্যম দেখা দিয়াছে, শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজী সেদিন যে স্বরাজের সঞ্জীবন-মন্ত্র ভারতবাসীর কর্ণে প্রদান করিয়াছেন, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ-রাজত্বে পরিণামে ভারতের কি অবস্থা হইবে, সে সম্বন্ধে রামমোহন বলিয়াছেন,—"কেনাডার সহিত ইংরাজের যেরূপ রাজনৈতিক সম্বন্ধ, ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সেই-রূপ সম্বন্ধ নিবদ্ধ হওয়া প্রার্থনীয়। এদেশ সভ্যতা ও জ্ঞানে উন্নত হইয়া, ইংলণ্ডের উপনিবেশ সকলের ন্যায় স্বাধীন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।" রাজার অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায়, এ বাণীও এক দিন সফল হইবে বলিয়া, আমরা বিশ্বাস করি; এবং ইতিমধ্যেই তাহার পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

সমাজ, ধর্ম্ম, ভাষা, রাজনীতি এমন কোন বিষয় নাই, যাহার সংস্কার ও উন্নতির জন্য রাজা আপনার শক্তি নিয়োগ করেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যত প্রকার অনুষ্ঠান ও সংস্কারের চেষ্টা দেখিতেছি, রাজা তাহাদের সকলেরই উৎস-স্বরূপ ছিলেন। কেবল কি তাই—তিনি একজন বহুভাষা-

ভিজ্ঞ মহাপণ্ডিত, শব্দ ও সাহিত্য-শাস্ত্রবিৎ অধ্যাপক, সূক্ষ্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন দার্শনিক, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ও বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, গভীর জ্ঞান, স্বাধীনতা, তেজস্বিতা, সত্যানুরাগ ও কার্য্যশক্তি চিন্তা করিলে, বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। কি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন করিয়াই, বিধাতা তাঁহাকে এই শক্তিহীন দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন! তাঁহার ন্যায় অলোকসামান্য ব্যক্তি ভূমণ্ডলে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিদেশ যাত্রা।

ভবিষ্য ভারতের সর্ব্ব বিষয়ে পথ-প্রদর্শক করিয়া, বিধাতা যাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি বিলাত-যাত্রা সম্বন্ধেও শিক্ষিত সমাজের অগ্রণী হইলেন। এদেশের কার্য্য যখন শেষ হইল, তখন বিধাতা তাঁহাকে জীবনের শেষ কার্য্য সম্পন্ন করাইবার জন্য, ইউরোপে প্রেরণ করিলেন। সূর্য্য যেমন পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া, পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হয়, তেমনই ভারত-সূর্য্য রামমোহনও পূর্ব্বদেশে উদিত হইয়া, পাশ্চাত্য-দেশে অস্তগমন করিলেন!

অনেক দিন হইতে রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের ইচ্ছা ছিল। তিনি স্বরচিত জীবন চরিতে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"এই সময়ে ইউরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচারব্যবহার, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার জন্য, স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা করিলাম। যাহা হউক, যে পর্য্যন্ত আমার মতাবলম্বী বন্ধুগণের দলবল বৃদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত আমার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।" এখন তিনি তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সংবাদ

প্রচার হওয়ায়, চারিদিকে বিষম আন্দোলন ও কোলাহল আরম্ভ হইল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি নূতন সনন্দ-লাভ করিবেন; ইহাতে ভারতের ভাবী শাসন-প্রণালী বহুকালের জন্য নির্দ্ধারিত হইবে, এবং সতীদাহ সম্বন্ধে প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল হইবে বলিয়া, তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর বাদসাহের কয়েকটী অধিকার হরণ করিয়াছিলেন; ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার ভারও তাঁহার প্রতি অর্পিত হয়। দিল্লীর বাদসাহ তাঁহাকে সনন্দদ্বারা 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য লোক তাঁহার বিলাত গমনে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। যিনি জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিতে যাইয়া, কোন বাধাকেই বাধা বলিয়া মনে করেন নাই, যিনি শত শত বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া, আপনার সাধনাকে সিদ্ধির গৌরবময় লক্ষ্যের দিকে লইয়া গিয়াছেন, সেই পুরুষ-সিংহের গতিরোধ করে, কাহার সাধ্য? বাধা-প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার উৎসাহ ও হৃদয়ের বল শতগুণ বৃদ্ধি পাইত। সংগ্রামেই তাঁহার আনন্দ ছিল, বিশ্রাম ও সংগ্রামহীনতা তাঁহার নিকট মৃত্যুর লক্ষণ বলিয়া মনে হইত। তিনি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। সেই জন্য বিলাত-যাত্রার কোন বাধাই গ্রাহ্য করিলেন না। সম্পত্তি-চ্যুতির ভয়ে তিনি সংকল্পচ্যুত হইলেন না। আত্মীয় স্বজনের অশ্রুজল তাঁহার

গন্তব্য পথ দুর্গম করিতে পারিল না। রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর তারিখে সোমবার দিবসে পালিত পুত্র রাজারাম, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রামহরি দাসকে সঙ্গে লইয়া, "অ্যাল্‌বিয়ান" নামক জাহাজে আরোহণ করিলেন। এইরূপ কথিত আছে, তিনি দুগ্ধের জন্য সঙ্গে একটী গাভী লইয়া গিয়াছিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখে তিনি লিভারপুল নগরে উপস্থিত হইলেন। জনৈক ভদ্র ইংরাজ তাঁহার বাটীতে থাকিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু রাজা স্বাধীনভাবে থাকিতে পারিবেন মনে করিয়া, এক হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই স্থানে প্রসিদ্ধ উইলিয়ম রস্কোর সহিত রাজার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। রস্কো পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের গুণগ্রামে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং আপনার রচিত পুস্তকাবলী রাজার জন্য ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই পুস্তক ভারতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রাজা বিলাতযাত্রা করেন। এই স্থানেই রাজার সহিত সুপ্রসিদ্ধ স্থত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্পরজিমের আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়। লিভারপুলের "মেওর" তাঁহাকে একটী ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই সময়ে মহাসভায় ত্বরায় "রিফরম্‌ বিল" লইয়া বাদানুবাদ হইবার কথা ছিল। সেই জন্য রাজা শীঘ্র লণ্ডনে যাত্রা করিলেন। পথে ম্যাঞ্চেষ্টারে অবতীর্ণ হইলেন। কুলিগণ ভারতের 'রাজাকে'

দেখিবার জন্য সমবেত হইল। তিনি অনেকের সহিত করমর্দ্দন করিলেন। তিনি লণ্ডনেও এক হোটেলে গিয়া উঠিলেন। সেই দিন বেলা ১১টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত দলে দলে বড় লোকেরা আসিয়া, রামমোহন রায়ের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন। যিনি আলাপ করিলেন, তিনিই রাজার মধুর চরিত্র ও ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হইলেন। এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ বেন্থাম সাহেবের সহিত তাঁহার আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়। ইংলণ্ডেশ্বরের অভিষেকের সময়ে বিদেশীয় দূতগণের সহিত তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। একটী প্রকাণ্ড ভোজে ইংলণ্ডেশ্বর রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি হবহাউস সাহেবও ৬ই জুলাই তারিখে তাঁহার সম্মানের জন্য, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে একটী ভোজ দিয়াছিলেন।

মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার, রাজার একজন পরম বন্ধু ছিলেন। হেয়ারের ভ্রাতারা লণ্ডনে বাস করিতেন। তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধ, তিনি তাঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া বাস করেন। রাজা যখন ফ্রান্সে গিয়াছিলেন, তখন হেয়ার সাহেবের এক ভ্রাতা তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। লণ্ডনের একেশ্বরবাদিগণ রাজা রামমোহন রায়ের সম্মানার্থ এক প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় সুবিখ্যাত স্যর জন বাউরিং বলিয়াছিলেন,—"যদি প্লেটো বা সক্রেটিস্, মিল্‌টন বা নিউটন হঠাৎ

আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে যেরূপ মনের ভাব হওয়া সম্ভব, তদনুরূপ ভাবে অভিভূত হইয়া, আমি রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যর্থনার জন্য হস্তপ্রসারণ করিয়াছি।” আরও অনেকে রাজার মহিমা বর্ণন করিয়া, বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে রাজা আপনার বক্তব্য প্রকাশ করেন। লণ্ডন বাসকালে সাম্যবাদের প্রবর্ত্তক রবার্ট ওয়েনের সহিত রাজার ঘোরতর তর্ক হয়। ওয়েন পরাস্ত হইয়া, রাগিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু রাজার স্বাভাবিক ভাবের কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই। এই সময়ে রাজা ভারতবর্ষের অবস্থা ও শাসন-সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টের কমিটীর নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি স্বদেশের কল্যাণার্থ ইংলণ্ডে কয়েকখানা পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে রাজা ফরাসী দেশে গমন করেন। ফরাসীগণও তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। সম্রাট লুই ফিলিপ্ অত্যন্ত সম্মানের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করেন। তত্রত্য কোন বিখ্যাত সভায়, তিনি মাননীয় সভ্য মনোনীত হন। এই স্থানে বিখ্যাত কবি টমাস্ মুরের সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং তাঁহারা একত্র আহার করেন। ফরাসীদেশে বাসকালে রামমোহন ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভের চেষ্টা করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজা আবার ইংলণ্ডে আগমন করেন, এবং হেয়ার সাহেবের ভ্রাতাদের গৃহে অতিথি হন। রাজার সুহৃদ-

ভাবে সকলেই আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য সকলেরই হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করিল। কুমারী লুসি একিন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার চেনিংকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে রাজার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"সকলেই রাজা রাম-মোহন রায়কে একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেছেন। প্রভূত ক্ষমতা ও প্রতিভার সহিত তাঁহার বিনয় ও সরলতা সকলের হৃদয়কে জয় করিতেছে। ইংরাজী ভাষার উপর তাঁহার বিশেষ অধিকার এবং ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বিলক্ষণ অভিজ্ঞ। তিনি স্বাধীনতা ও উন্নতির একান্ত পক্ষপাতী। রাজাকে দেখিয়া অবধি আমার মনের ভাব অধিকতর উদার ও সার্ব্বভৌমিক হইয়াছে।"

রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি বিলাতের লোক সকল এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, রেভারেণ্ড ডেভিসন্ সাহেব তাঁহার পরিবারস্থ একটী বালকের নাম "রামমোহন রায়" রাখিলেন। এই বালকটীকে রাজা অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি এমন বিনয়, প্রতিভা ও ভদ্রতার সহিত বিপক্ষের সহিত বাদানুবাদ করিতেন যে, প্রতিপক্ষ তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতেন না। প্রতিবাদের সময়ে তিনি বিপক্ষের মতের উপর সমধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার প্রখর বুদ্ধি বিপক্ষের মতকে খণ্ড বিখণ্ড করিত, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার বিনয় ও ভদ্রতা বিপক্ষের হৃদয়কে জয় করিত। তিনি একদিকে বজ্র হইতেও

কঠিন, আবার অন্যদিকে কুসুম হইতেও কোমল ছিলেন। অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যখন দণ্ডায়মান হইতেন, তখন তাঁহার গর্জ্জন ও হুঙ্কারে স্বর্গ মর্ত্ত্য বিচলিত হইত। আবার ভদ্রতা ও শিষ্টতায় তিনি লোকের নিকট মৃদুভাব ধারণ করিতেন। স্ত্রীলোকদিগকে তিনি আজীবন শ্রদ্ধা করিতেন। মহিলাগণ তাঁহার সমীপস্থ হইলে, তিনি সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইতেন। মিসেস্ ডেভিসন্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"নিশ্চয়ই এমন বিনয়ী মানুষ আর নাই। তিনি এরূপ সসম্ভ্রমে আমার সহিত ব্যবহার করিতেন, যে তাহাতে আমি লজ্জিত হইতাম। আমি যদি দেশের মহারাণী হইতাম, তাহা হইলেও কেহ আমাকে এত অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিত না।" প্রত্যেকের সহিত তিনি এইরূপ ব্যবহার করিতেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্গারোহণ।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রাজা বৃষ্টলে গমন করিয়া, "ষ্টেপল্‌টন্ গ্রোভ্" নামক একটী সুন্দর ভবনে কুমারী কিডেল্ ও কুমারী কাসেলের অতিথিরূপে বাস করেন। হেয়ার সাহেবের ভগ্নী রাজার সহিত লণ্ডন হইতে ব্রিষ্টলে আসিয়াছিলেন। প্রায় প্রতিদিন ডাক্তার কার্পেণ্টারের সহিত নানা বিষয়ে তাঁহার আলাপ হইত। তাঁহার ব্যবহার এমনই মনোরম ও আনন্দপ্রদ ছিল যে, বৃষ্টলের অনেক বড় বড় লোক তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তিনি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের উপাসনাতেই যোগদান করিতেন। তিনি এ সম্বন্ধে কোন সাম্প্রদায়িক ভাবে আবদ্ধ ছিলেন না। বৃষ্টলে কুমারী কার্পেণ্টারের সহিত রাজার বন্ধুত্ব জন্মে। তাঁহার সংসর্গের প্রভাবেই কুমারী কার্পেণ্টার ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য তাঁহার শরীর, মন ও অর্থ সবই নিয়োগ করিয়াছিলেন।

১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে বৃষ্টলবাসী অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি, নিমন্ত্রিত হইয়া, রাজার নিকট আগমন করেন। উপস্থিত পণ্ডিতগণ ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি ঘটিত অনেক প্রশ্ন করেন। রাজা রামমোহন রায় ক্রমাগত তিন ঘণ্টা কাল

দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাহার উত্তর প্রদান করিলেন। রাজার পাণ্ডিত্য, অসাধারণ তর্কশক্তি ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া, উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। কে জানিত, ইহাই রাজার জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কের অভিনয়!

এই অতিরিক্ত পরিশ্রম ও উৎসাহে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর তাঁহার অবসন্ন ভাব দেখিয়া, বন্ধুগণ তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু তিনি যে অনন্ত বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখনও কেহই তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সেদিনও বন্ধুগণের সহিত ধর্ম্মালাপ করেন। রাজা ১৯শে তারিখে জ্বরে শয্যাগত হন। ক্রমে তাহা বিকারে পরিণত হয়। প্রধান প্রধান চিকিৎসক যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কুমারী হেয়ার দিবা-রাত্রি রাজার সেবা করিতে লাগিলেন।

২৩শে তারিখে বিখ্যাত ডাক্তার ক্যারিককে আনয়ন করা হইল। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, রাজার মস্তিষ্কই অধিক বিকল হইয়াছে। মস্তকে জোঁক বসান হইল। ২৪শে তারিখে রাজা বেশ শান্তভাবে নিদ্রা গেলেন; কিন্তু নিদ্রিতা-বস্থায় চক্ষু খোলা ছিল। ২৬শে তাঁহার ধনুষ্টঙ্কার হইতে লাগিল ও মুখ বাঁকিয়া যাইতে লাগিল। চুল কাটিয়া মাথায় শীতল জল দেওয়া হইল। বাম বাহু ও পদ অবশ বোধ হইল। কি ঘটিবে মনে করিয়া, সকলে ভীত হইলেন। অবিশ্রান্ত সেবা

ও চিকিৎসা চলিতে লাগিল। তিনি যে সে যাত্রা রক্ষা পাইবেন না, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং বন্ধুদিগকেও সে কথা বলিয়াছিলেন। অন্তিম সময়ে তাঁহাকে সর্ব্বদাই উপাসনার ভাবে বিভোর দেখা যাইত।

২৭শে সেপ্টেম্বর। অম্ভ সুধাধবলিত রজনী। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। কুমারী হেয়ার হতাশ ও শোক-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। রাত্রি দেড় ঘটিকার সময়ে রাজার উর্দ্ধশ্বাস আরম্ভ হইল। তাঁহার বন্ধুগণ ব্যাকুল প্রাণে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মৃত্যুর করালচ্ছায়া রাজার চিরপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। ২টা ২৫ মিনিটের সময়ে ধীরে ধীরে মৃত্যু আসিয়া, রাজার শেষ নিঃশ্বাসের সহিত, তাঁহার আত্মাকে দেহপিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া গেল! সেই পবিত্র মুখে এক অপূর্ব্ব শান্তি ও গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছিল। জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া, পুরুষ-সিংহ অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন!

রাজার ইচ্ছানুসারে "ষ্টেপল্‌টন গ্রোভের" নিকটবর্ত্তী, এক নির্জ্জন বৃক্ষ-বাটিকায় ১৮ই অক্টোবর শুক্রবার তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হইল। পরে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়, উক্ত স্থান হইতে শব "আরনোস্ ভেল" নামক স্থানে আনয়ন করেন এবং তাহার উপর একটী সুন্দর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণ আদর্শ

মানবের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যত প্রকার বৃত্তি আছে, ইহাদের সামঞ্জসীভূত উন্নতিই পূর্ণ মানবত্ব। মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন অংশ যদি অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়, এবং অপরাপর অংশ তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই দেহকে কখন আমরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ণ বলিতে পারি না। দেহের সম্বন্ধে যেমন, মনুষ্যত্ব সম্বন্ধেও তেমনই। বিধাতা মানবকে যতগুলি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, চর্চ্চাদ্বারা সবগুলিরই উৎকর্ষ সাধন করা কর্ত্তব্য। কোন বৃত্তির অত্যধিক চর্চ্চা, অপরগুলির চর্চ্চাভাবে অবনতি— ইহাকে কখনও প্রকৃত উন্নতি বলা যায় না। কর্ম্মে, জ্ঞানে, ও ভাবে মানুষকে উন্নতি লাভ করিতে হইবে। পূর্ণতার এই আদর্শ জগতে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও জীবনের শেষভাগে "কৃষ্ণ-চরিত্র" প্রভৃতিতে এই পূর্ণতার আদর্শই অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জগতকে এই পূর্ণ আদর্শ প্রদান করিবার জন্য বিধাতা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, এবং তদনুরূপ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক

শক্তিসামর্থ্যও লাভ করিয়াছিলেন। কি শরীর, কি মন, কি আত্মা, যে দিক্ দিয়াই চিন্তা করি না কেন, সেই দিকেই রাজার মহীয়সী শক্তির পরিচয় পাইয়া অবাক্ হই। তাঁহার আজানুলম্বিত বাহুযুগল, বীরবপু, উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়, সুবৃহৎ মস্তক—সকলই তাঁহার মহাপুরুষত্ব ঘোষণা করিতেছে। মুণ্ডতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্পারজিম তাঁহার মস্তকের গঠন দেখিয়া, তাঁহাকে একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরে প্রভূত বল ছিল। তিনি সমস্ত দিনে বার সের দুগ্ধ পান করিতেন এবং পঞ্চাশটা আম না হইলে তাঁহার জলযোগ হইত না।

আকারসদৃশপ্রজ্ঞ রামমোহন রায়ের যেমন উন্নত ও বীরত্বব্যঞ্জক কলেবর ছিল, সেইরূপ মানসিক শক্তিও অসাধারণ ছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দর্শন করিয়া, ইংলণ্ডের সুধীসমাজ তাঁহাকে সক্রেটিস্ ও নিউটনের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। তিনি যখন হিন্দুশাস্ত্রের সাহায্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, এবং খৃষ্টীয় শাস্ত্রের সাহায্যে মিশনরীদিগের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন উভয় সমাজে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব বিচার-কৌশল, অসাধারণ উপস্থিতবুদ্ধি দেখিয়া, বিপক্ষগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। মুসলমানগণ তাঁহাকে জবরদস্ত মৌলবী বলিয়া অভিহিত করিতেন। কি রাজবিধি,

কি সাংসারিক-ব্যাপার, কি দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র—সকল বিষয়েই রাজা অসাধারণ শক্তি ধারণ করিতেন। একাধারে এত শক্তি, এত গুণ, জগতে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। জগতের কোন মহাপুরুষই এত বিভিন্ন বিষয়ের সংস্কার ও উন্নতি-সাধন করিয়া যান নাই।

যেমন তাঁহার শরীর মন, তেমনই তাঁহার আত্মাও বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ ছিল। তাঁহার ব্রতউদ্‌যাপন অধ্যায়ে, আমরা তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। অনেক সময়ে তিনি উপাসনার ভাবে বিভোর থাকিতেন। সমাজ-মন্দিরে যখন বিষ্ণু গান করিতেন, তখন রাজা প্রেমভরে আনন্দাশ্রুপাত করিতেন। তিনি স্নানকালে পূর্ণ জলাশয়ে অবগাহন করিয়া, হাফেজের কবিতাদি আবৃত্তি করিতেন; ইহা তাঁহার এক প্রকার উপাসনা ছিল। যখন তিনি তাঁহার বিশ্বজনীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেন, ভাবাবেশে তাঁহার গণ্ডস্থল অশ্রুসিক্ত হইত। তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে গভীর জলধি উদ্বেলিত হইয়া উঠিত! তিনি ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালে কখন কখন চক্ষু মুদ্রিত করিতেন। লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"মানুষের মন দুর্ব্বল, সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।" পবিত্রতার প্রতি কি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি! রামমোহন রায় হিরণ্ময়-কোষস্থিত নিষ্কল ব্রহ্মকে প্রীতি করিয়া—তাঁহার আদেশ পালন করিয়া, কৃতকৃতার্থ

হইতেন। যখন তাঁহাকে উৎসাহ দিবার কেহই ছিলেন না, যখন চারিদিকে শত্রুকুল তাঁহাকে বিপন্ন ও উপদ্রুত করিয়া তুলিয়াছিল, যখন তিনি মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-ক্রোড় হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তখন তিনি কাহার মুখের দিকে তাকাইয়া, অম্লানবদনে ও অবিকৃত-চিত্তে এসব সহ্য করিয়াছিলেন ? চিরপ্রসন্ন ভগবানই তাঁহার প্রাণে আশা, বল ও আনন্দ প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজা সেই জীবনাশ্রয়ের নিকট বললাভ করিয়াই অযুত হস্তীর বলে, অসত্যের দুর্গ আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি তাঁহার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্য ও ঈশ্বরানুরাগ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

উপসংহারে রাজার সম্বন্ধে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত যে অক্ষয়বাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' হইতে আমরা তাহার কিছু উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"ধন্য রামমোহন রায়! সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধি-জ্যোতিঃ ঘোরতর অজ্ঞানরূপ নিবিড় জলদ-রাশি বিদীর্ণ করিয়া, এত দূর বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে তোমার সুবিমল স্বচ্ছচিত্ত যে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার নির্ব্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নয়। তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয় জঙ্গলময়-পঙ্কিল-ভূমি-

পরিবেষ্টিত একটী অগ্নিময় আগ্নেয়গিরি ছিল; তাহা হইতে পুণ্যপবিত্র প্রচুর জ্ঞানাগ্নি, সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। তুমি বিজ্ঞানের অনুকূল পক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণকুহর ধ্বনিত করিতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি অদ্যাপি বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া, এই অযোগ্য দেশেও জয়-সাধন করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশ-ব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার উদ্দেশে আততায়ি-স্বরূপে, রণ-দুর্ম্মদ বীরপুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ, এবং বিচার-যুদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়া, নিঃসংশয়ে সম্যক-রূপে জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমি-খণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটী সুবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন সুমার্জ্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিত-সম্প্রদায় তোমাকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিয়া আসি-তেছে। যাঁহারা আবহমানকাল হিন্দুজাতির মনোরাজ্যে, নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে পরা-জয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়-পতাকা তাঁহাদেরই স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, আর পতিত হইল না; নিয়ত একভাবেই উড্ডীয়মান্ রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে পরম শত্রু

বলিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা, অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু!

"একদিকে জ্ঞান ও ধর্ম্মভূষণে ভূষিত করিয়া জন্মভূমিকে উজ্জ্বল করিবার যত্ন করিয়াছ, অপর দিকে সঙ্কটময় সুগভীর সমুদ্র সমূহ উত্তরণ পূর্ব্বক ব্রিটিস রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, নানা বিষয়ে রাজশাসন-প্রণালীর সংশোধন ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছ। সে সময়ের পক্ষে এ কি কাণ্ড! কি ব্যাপার! স্বাভাবিক শক্তির এতই মহিমা! তুমি ইংলণ্ডে গিয়া অধিষ্ঠান করিলে, তথাকার সুপণ্ডিত সাধু লোকে তোমার অসাধারণ গুণ-গ্রাম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যায়। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, একবার তথাকার কোন সজ্জন-সমাজে চমৎকার-সংবলিত এরূপ একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, যেন সাক্ষাৎ প্লেটো, সক্রেটিস বা নিউটন ধরণী-মণ্ডলে পুনরায় উপস্থিত হইলেন! তুমি আপন সময়ের অতীত বস্তু। কেবল সময়েরই কেন? আপন দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন—এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্মগ্রহণ অবনীমণ্ডলে আর কখনও ঘটিয়াছিল, বোধ হয় না!"

পরিশিষ্ট।

রামমোহন রায়। *

মহাপুরুষেরা সমস্ত মানবজাতির গৌরবের ও আদর্শের স্থল বটেন, কিন্তু তাঁহারা জাতিবিশেষের বিশেষ গৌরবের স্থল, তাহার আর সন্দেহ নাই। গৌরবের স্থল বলিলে যে কেবলমাত্র সামান্য অহঙ্কারের স্থল বুঝায়, তাহা নহে, গৌরবের স্থল বলিলে শিক্ষার স্থল, বললাভের স্থল বুঝায়। মহাপুরুষদিগের মহৎকার্য্যসকল দেখিয়া কেবলমাত্র সম্ভ্রম-মিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হইলেই যথেষ্ট ফললাভ হয় না—তাঁহাদিগকে যতই 'আমার' মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি যতই প্রেমের উদ্রেক হয়, ততই তাঁহাদের কথা, তাঁহাদের কার্য্য, তাঁহাদের চরিত্র আমাদের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠে। যাঁহাদিগকে লইয়া আমরা গৌরব করি, তাঁহাদিগকে শুদ্ধ-মাত্র যে আমরা ভক্তি করি, তাহা নহে, তাঁহাদিগকে 'আমার' বলিয়া মনে করি। এই জন্য তাঁহাদের মহত্ত্বের আলোক বিশেষরূপে আমাদেরই উপরে আসিয়া পড়ে,

* ১২৯১ সালের ৫ই মাঘ, সিটি কলেজ গৃহে, রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক এই প্রবন্ধটী পঠিত হয়।

বিশেষরূপে আমাদেরই মুখ উজ্জ্বল করে। শিশু যেমন সহস্র বলবান্ ব্যক্তিকে ফেলিয়া বিপদের সময় পিতার কোলে আশ্রয় লইতে যায়, তেমনি আমরা দেশের দুর্গতির দিনে আর সকলকে ফেলিয়া আমাদের স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের অটল আশ্রয় অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তখন আমাদের নিরাশহৃদয়ে তাঁহারা যেমন বলবিধান করিতে পারেন, এমন আর কেহই নহে। ইংলণ্ডের দুর্গতি কল্পনা করিয়া কবি ওয়ার্ড্‌স্বার্থ পৃথিবীর আর সমস্ত মহাপুরুষকে ফেলিয়া কাতরস্বরে মিল্টন্‌কেই ডাকিলেন, কহিলেন,—"মিল্টন, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে ইংলণ্ডের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে।" যে জাতির মধ্যে স্বদেশীয় মহাপুরুষ জন্মান নাই, সে জাতি কাহার মুখ চাহিবে, তাহার কি দুর্দ্দশা! কিন্তু যে জাতির মধ্যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপিও যে জাতি কল্পনার জড়তা, হৃদয়ের পক্ষাঘাত বশতঃ তাঁহার মহত্ত্ব কোনমতে অনুভব করিতে পারে না, তাহার কি দুর্ভাগ্য।

আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা বঙ্গসমাজের বড় বড় যশোবুদ্বুদদিগকে বালুকার সিংহাসনের উপর বসাইয়া দুইদিনের মত পুষ্পচন্দন দিয়া মহত্ত্বপূজার স্পৃহা খেলাচ্ছলে চরিতার্থ করিতেছি, বিদেশীয়দের অনুকরণে কথায় কথায় সভা ডাকিয়া চাঁদা তুলিয়া মহত্ত্বপূজার একটা ভাণ ও আড়ম্বর করিতেছি!

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; তাঁহার নির্ম্মিত ভবনে বাস করিতেছি। তিনি আমাদের জন্য যে কত করিয়াছেন, কত করিতে পারিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস জন্মিবে। আমাদিগকে যদি কেহ বাঙ্গালী বলিয়া অবহেলা করে, আমরা বলিব, রামমোহন রায় বাঙ্গালী ছিলেন।

রামমোহন রায়ের চরিত্র আলোচনা করিবার একটি গুরুতর আবশ্যকতা আছে। আমাদের এখনকার কালে তাঁহার মত আদর্শের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা কাতর-স্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি,—"রামমোহন রায়, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে বঙ্গদেশের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে! আমরা বাক্‌পটু লোক—আমাদিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও। আমরা আত্মম্ভরী—আমাদিগকে আত্মবিসর্জ্জন দিতে শিখাও। আমরা লঘুপ্রকৃতি—বিপ্লবের স্রোতে চরিত্রগৌরবের প্রভাবে আমাদিগকে অটল থাকিতে শিখাও। আমরা বাহিরের প্রখর আলোকে অন্ধ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ চিরোজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে ভালমন্দ নির্ব্বাচন করিতে, ও স্বদেশের পক্ষে যাহা স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল, তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও!"

রামমোহন রায় যথার্থ কাজ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে প্রগল্‌ভা রসনার এত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং তাহার এত সমাদরও ছিল না। কিন্তু আর একটা কথা দেখিতে হইবে। একএকটা সময়ে কাজের ভিড় পড়িয়া যায়, কাজের হাট বসিয়া যায়, তখন কাজ করিতে অথবা কাজের ভাণ করিতে একটা আমোদ আছে। তখন সেই কার্য্যাড়ম্বর নাট্যরস জন্মাইয়া মানুষকে মত্ত করিয়া তুলে, বিশেষতঃ একটা তুমুল কোলাহলে সকলে বাহ্যজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া একপ্রকার বিহ্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে বঙ্গসমাজের সে অবস্থা ছিল না। তখন কাজে মত্ততাসুখ ছিল না, একাকী ধীরভাবে সমস্ত কাজ করিতে হইত। সঙ্গিহীন সুগম্ভীর সমুদ্রের গর্ভে যেমন নীরবে অতি ধীরে ধীরে দ্বীপ নির্ম্মিত হইয়া উঠে, সঙ্কল্প তেমনি অবিশ্রাম নীরবে গভীর হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া কার্য্য-আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। মহত্ত্বের প্রভাবে, হৃদয়ের অনুরাগের প্রভাবে কাজ না করিলে কাজ করিবার আর কোন প্রবর্ত্তনাই তখন বর্ত্তমান ছিল না। অথচ কাজের ব্যাঘাত এখনকার চেয়ে ঢের বেশী ছিল। রামমোহন রায়ের যশের প্রলোভন কিছুমাত্র ছিল না। তিনি যতগুলি কাজ করিয়াছিলেন, কোন কাজেই তাঁহার সম-সাময়িক স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে যশের প্রত্যাশা করেন নাই। নিন্দাগ্লানি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তাঁহার মাথার

উপরে অবিশ্রাম বর্ষিত হইয়াছে—তবুও তাঁহাকে তাঁহার কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারে নাই। নিজের মহত্ত্বে তাঁহার কি অটল আশ্রয় ছিল, নিজের মহত্ত্বের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের কি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ছিল, স্বদেশের প্রতি তাঁহার কি স্বার্থশূন্য সুগভীর প্রেম ছিল! তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই,—তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদূরে ছিলেন; তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্ম্মস্থলের সহিত আপনার সুদৃঢ় যোগরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীয় শিক্ষায় সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গুরুতর যে স্বদেশীয়ের উৎ-পীড়ন, তাহাতেও সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কি না করিয়াছিলেন? শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, বঙ্গসাহিত্য বল, সমাজ বল, ধর্ম্ম বল, বঙ্গসমাজের যে কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র। বঙ্গ-সমাজের সর্ব্বত্রই তাঁহার স্মরণস্তম্ভ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে; তিনি এই মরুস্থলে যে সকল বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহারা বৃক্ষ হইয়া শাখা-প্রশাখায় প্রতিদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। তাহা-রই বিপুল ছায়ায় বসিয়া আমরা কি তাঁহাকে স্মরণ করিব না?

তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়; আবার তিনি যাহা না করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরও প্রকাশ পায়। তিনি যে এত কাজ করিয়াছেন, কিছুরই মধ্যে তাঁহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে নিজের অথবা আর কাহারও প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি গড়িয়া-পিটিয়া একটা নূতন ধর্ম্ম বানাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া পুরাতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তিনি নিজেকে গুরু বলিয়া চালাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া প্রাচীন ঋষিদিগকে গুরু বলিয়া মানিলেন। তিনি তাঁহার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই, বরং তাহার প্রতিকূলতা করিয়াছেন। এরূপ আত্মবিলোপ এখন ত দেখা যায় না। বড় বড় সংবাদপত্রপুট পরিপূর্ণ করিয়া অবিশ্রাম নিজের নামসুধাপানে এক প্রকার মত্ততা জন্মাইয়া আমাদের কাজের উৎসাহ জাগাইয়া রাখিতে হয়,—দেশের জন্য যে সামান্য কাজটুকু করি, তাহাও বিদেশী-আকারে সমাধা করি, চেষ্টা করি,—যাহাতে সে কাজটা বিদেশীয়দের নয়ন-আকর্ষণ পণ্যদ্রব্য হইয়া উঠে। স্তুতিকোলাহল ও দলস্থ লোকের অবিশ্রাম একমন্ত্রোচ্চারণশব্দে বিব্রত থাকিয়া স্থির-ভাবে কোন বিষয়ের যথার্থ ভালমন্দ বুঝিবার শক্তিও থাকে

না, ততটা ইচ্ছাও থাকে না, একটা গোলযোগের আবর্ত্তের মধ্যে মহানন্দে ঘুরিতে থাকি ও মনে করিতে থাকি, বিদ্যুদ্‌বেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি।

আমরা যে আত্মবিলোপ করিতে পারি না, তাহার কারণ, আমরা আপনাকে ধারণ করিতে পারি না। সামান্যমাত্র ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইলেই আমরাই সর্ব্বোপরি ভাসিয়া উঠি। আত্মগোপন করিতে পারি না বলিয়াই সর্ব্বদা ভাবিতে হয়, আমাকে কেমন দেখিতে হইতেছে। যাঁহারা মাঝারী-রকমের বড় লোক, তাঁহারা নিজের শুভসঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে চান বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে আপনাকেও প্রচলিত করিতে চান। এ বড় বিষম অবস্থা। আপনিই যখন আপনার সঙ্কল্পের প্রতি-যোগী হইয়া উঠে, তখন সঙ্কল্পের অপেক্ষা আপনার প্রতি আদর স্বভাবতই কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া পড়ে। তখন সঙ্কল্প অনেক সময়ে হীনবল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কথায় কথায় তাহার পরিবর্ত্তন হয়। কিছু-কিছু ভাল কাজ সম্পন্ন হয়, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাজটি হইয়া উঠে না। যে আপনার পায়ে আপনি বাধাস্বরূপ বিরাজ করিতে থাকে, সংসারের সহস্র বাধা সে অতিক্রম করিবে কি করিয়া? যে ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া সংসারের মধ্যস্থলে নিজের শুভকার্য্য স্থাপন করে, সে স্থায়ী ভিত্তির উপরে নিজের মঙ্গলসঙ্কল্প প্রতিষ্ঠিত করে। আর যে নিজের উপরেই সমস্ত কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করে, সে যখন

চলিয়া যায়, তাহার অসম্পূর্ণ কার্য্যও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়; যদি বা বিশৃঙ্খল ভগ্নাবশেষ ধূলির উপরে পড়িয়া থাকে, তবে তাহার ভিত্তি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রামমোহন রায় আপনাকে ভুলিয়া নিজের মহতী ইচ্ছাকে বঙ্গসমাজের মধ্যে রোপণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি না থাকিলেও আজ তাঁহার সেই ইচ্ছা সজীবভাবে প্রতিদিন বঙ্গসমাজের চারিদিকে অবিশ্রাম কাজ করিতেছে। সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার স্মৃতি হৃদয়পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার সেই অমর ইচ্ছার বংশ বঙ্গসমাজ হইতে বিলুপ্ত করিতে পারে না।

রামমোহন রায়ের আত্মধারণাশক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল, তাহা কল্পনা করিয়া দেখুন। অতি বাল্যকালে যখন তিনি হৃদয়ের পিপাসায় ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে আকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে-বাহিরে কি সুগভীর অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল! যখন এই মহানিশীথিনীকে মুহূর্ত্তে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রখর আলোক দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন তাহাতে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে নাই। সে তেজ, সে আলোক তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন। যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অন্ধকারময় অঙ্গারের খনিতে যদি বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে, তবে সে কি কাণ্ডই উপস্থিত হয়, ভূগর্ভ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তেমনি সহসা জ্ঞানের

নূতন উচ্ছ্বাস কয়জন সহজে ধারণ করিতে পারেন? কিন্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত মহৎ ছিলেন, এই জন্য এই জ্ঞানের বন্যায় তাঁহার হৃদয় অটল ছিল; এই জ্ঞানের বিপ্লবের মধ্যে মাথা তুলিয়া, যাহা আমাদের দেশে ধ্রুব মঙ্গলের কারণ হইবে, তাহা নির্ব্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন। এ সময়ে ধৈর্য্যরক্ষা করা যায় কি? আজিকার কালে আমরা ত ধৈর্য্য কাহাকে বলে, জানিই না। কিন্তু রামমোহন রায়ের কি অসামান্য ধৈর্য্যই ছিল। তিনি আর সমস্ত ফেলিয়া পর্ব্বত-প্রমাণ স্তূপাকার ভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন যে অগ্নি, ফুৎকার দিয়া তাহাকেই প্রজ্বলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি চমক লাগাইবার জন্য বিদেশী দেশালাই কাঠি জ্বালাইয়া যাদুগিরি করিতে চাহেন নাই। তিনি জানিতেন, ভস্মের মধ্যে যে অগ্নিকণিকা অবশিষ্ট আছে, তাহা ভারতবাসীর হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে নিহিত, সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে আর নিভিবে না।

রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তখন এখানে চতুর্দ্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মিথ্যা ও মৃত্যু নামক মায়াবী রাজাদের প্রকৃত বল নাই, অমোঘ অস্ত্র নাই, কোথাও তাহাদের দাঁড়াইবার স্থল নাই, কেবল নিশীথের অন্ধকার ও একপ্রকার অনির্দ্দেশ্য বিভীষিকার

উপরে তাহাদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অজ্ঞান, আমাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই তাহাদের বল। অতি-বড় ভীরুও প্রভাতের আলোকে প্রেতের নাম শুনিলে হাসিতে পারে, কিন্তু অন্ধকার নিশীথিনীতে একটি শুষ্কপত্রের শব্দ, একটি তৃণের ছায়াও অবসর পাইয়া আমাদের হৃদয়ে নিষ্ঠুর আধিপত্য করিতে থাকে। যথার্থ দস্যুভয় অপেক্ষা সেই মিথ্যা অনির্দ্দেশ্য ভয়ের শাসন প্রবলতর। অজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যেমন নিরুপায়, যেমন অসহায়, এমন আর কোথায়! রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের হিন্দুধর্ম্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল। তাহার জীবন নাই, অস্তিত্ব নাই, কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র। সেই নিশীথে শ্মশানে সেই ভয়ের বিপক্ষে 'মা ভৈঃ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া যিনি একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার মাহাত্ম্য আমরা আজিকার এই দিনের আলোকে হয় ত ঠিক অনুভব করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি সর্পবধ করিতে অগ্রসর হয়, তাহার কেবলমাত্র জীবনের আশঙ্কা থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তুসর্প মারিতে যায়, তাহার জীবনের আশঙ্কার অপেক্ষা অনির্দ্দেশ্য অমঙ্গলের আশঙ্কা বলবত্তর হইয়া উঠে। তেমনি রামমোহন রায়ের সময়ে হিন্দুসমাজের ভগ্নভিত্তির সহস্র ছিদ্রে সহস্র বাস্তু-অমঙ্গল

উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধমান বংশপরম্পরা লইয়া প্রাচীনতা ও জড়তার প্রভাবে অতিশয় স্থূলকায় হইয়া উঠিতেছিল। রামমোহন রায় সমাজকে এই সহস্র নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই নিদারুণ বন্ধন অনুরাগবন্ধনের ন্যায় সমাজকে জড়াইয়াছিল, এইজন্য সমস্ত বঙ্গসমাজ আর্ত্তনাদ করিয়া রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে উত্থান করিল। আজ আমাদের বালকেরাও সেই সকল মৃতসর্পের উপরে হাস্যমুখে পদাঘাত করে, আমরা তাহাদিগকে নির্ব্বিষ ঢোঁড়াসাপ বলিয়া উপহাস করি—ইহাদের প্রবল-প্রতাপ, ইহাদের চক্ষের মোহ-আকর্ষণ, ইহাদের সুদীর্ঘ লাঙ্গুলের ভীষণ আলিঙ্গনের আশঙ্কা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

একবার ভাঙ্চুর করিতে আরম্ভ করিলে একটা নেশা চড়িয়া যায়। সৃজনের যেমন আনন্দ আছে, প্রলয়ের তেমনি একপ্রকার ভীষণ আনন্দ আছে। যাঁহারা রাজনারায়ণ বাবুর "একাল ও সেকাল" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, নূতন ইংরাজিশিক্ষা লাভ করিয়া বাঙ্গালী ছাত্রেরা যখন হিন্দুকালেজ হইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁহাদের কিরূপ মত্ততা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গুরুতর আঘাতে হিন্দুসমাজের হৃদয় হইতে রক্তপাত করিয়া তাহাই লইয়া প্রকাশ্যপথে আবীর খেলাইতেন। কঠোর অট্টহাস্য ও নিষ্ঠুর উৎসবের কোলাহল তুলিয়া তখনকার শ্মশানদৃশ্য তাঁহারা আরও ভীষণ-

তর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হিন্দুসমাজের কিছুই ভাল, কিছুই পবিত্র ছিল না। হিন্দুসমাজের যে সকল কঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাদের ভালরূপ সংকার করিয়া শেষ ভস্মমুষ্টি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া বিষণ্নমনে যে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, প্রাচীন হিন্দুসমাজের স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের ততটুকুও শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কালভৈরবের অনুচর ভূতপ্রেতের ন্যায় শ্মশানের নরকপালে মদিরাপান করিয়া বিকট উল্লাসে উন্মত্ত হইতেন। সে সময়কার অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের ততটা দোষ দেওয়া যায় না। প্রথম বিপ্লবের সময় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। একবার ভাঙ্গিবার দিকে মন দিলে প্রলয়ের আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে। সে সময়ে খানিকটা খারাপ লাগিলেই সমস্তটা খারাপ লাগে, বাহিরটা খারাপ লাগিলেই ভিতরটা খারাপ লাগে। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজে বিপ্লবের আগ্নেয়-উচ্ছ্বাস সর্ব্বপ্রথমে যিনি উৎসারিত করিয়া দিলেন—সেই রামমোহন রায়—তাঁহার ত এরূপ মত্ততা জন্মে নাই। তিনি ত স্থিরচিত্তে ভালমন্দ সমস্ত পর্য্য-বেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি আলোক জ্বালাইয়া দিলেন, কিন্তু চিতালোক ত জ্বালান নাই। ইহাই রামমোহন রায়ের প্রধান মহত্ত্ব। কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান ও জীবনহীন তন্ত্র-মন্ত্রের মধ্যে জীবন্তে সমাহিত হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিলেন। যে মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম্ম দিন দিন অবসন্ন

মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল, যে জড় পাষাণস্তূপে পিষ্ট হইয়া হিন্দুধর্ম্মের হৃদয় হতচেতন হইয়া পড়িতেছিল, সেই মৃতভার, সেই জড়স্তূপে রামমোহন রায় প্রচণ্ডবলে আঘাত করিলেন, তাহার ভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহার আপাদমস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। হিন্দুধর্ম্মের বিপুলায়তন প্রাচীনমন্দির জীর্ণ হইয়া প্রতিদিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, অবশেষে হিন্দুধর্ম্মের দেবপ্রতিমা আর দেখা যাইতেছিল না, কেবল মন্দিরেরই কাষ্ঠ-লোষ্ট-ধূলিস্তূপ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার গর্ভের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছিল, ছোট বড় নানাবিধ সরীসৃপগণ গুহানির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহার ইতস্তত প্রতিদিন কণ্টকাকীর্ণ গুল্মসকল উদ্ভিন্ন হইয়া সহস্র শিকড়ের দ্বারা নূতন নূতন বন্ধনে সেই পুরাতন ভগ্নাবশেষকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুসমাজ দেবপ্রতিমাকে ভুলিয়া এই জড়স্তূপকে পূজা করিতেছিল ও পর্ব্বতপ্রমাণ জড়ত্বের তলে পড়িয়া প্রতিদিন চেতনা হারাইতেছিল। রামমোহন রায় সেই ভগ্নমন্দির ভাঙ্গিলেন, সকলে বলিল, তিনি হিন্দুধর্ম্মের উপরে আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্ম্মের জীবনরক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এইজন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। কি সঙ্কটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার একদিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর একদিকে বিদেশীয় সভ্যতা-সাগরের প্রচণ্ড-

বন্যা বিদ্যুদ্‌বেগে অগ্রসর হইতেছিল, রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, খৃষ্টীয়বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মত মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।

এখানে রামমোহন রায়ের উদারতাসম্বন্ধে হয় ত দু' একটা কথা উঠিতে পারে। ভস্মস্তূপের মধ্যে ঋষিদের হৃদয়জাত যে অমর-অগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল, ভস্ম উড়াইয়া দিয়া তিনি তাহাই বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তাহার উত্তর এই—বিজ্ঞানদর্শনের ন্যায় ধর্ম্ম যদি কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার, লাভ করিবার, সঞ্চয় করিবার বিষয় না হইত, ধর্ম্ম যদি গৃহের অলঙ্কারের ন্যায় কেবল গৃহভিত্তিতে দুলাইয়া রাখিবার সামগ্রী হইত, আমাদের সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্রকাজের প্রবর্ত্তক-নিবর্ত্তক না হইত, তাহা হইলে এরূপ না করিলেও চলিত। তাহা হইলে নানাবিধ বিদেশী অলঙ্কারে গৃহ সাজাইয়া রাখা যাইত। কিন্তু ধর্ম্ম নাকি হৃদয়ে পাইবার ও সংসারের কাজে ব্যবহার করিবার দ্রব্য, দূরে রাখিবার নহে, এইজন্যই স্বদেশের ধর্ম্ম স্বদেশের জন্য বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রহ্ম। অন্য কোন দেশের

লোকে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না, ব্রহ্ম বলিতে আমরা ঈশ্বরকে যেরূপভাবে বুঝি, ঈশ্বরের অন্য কোন বিদেশীয় নামে বিদেশীয়েরা কখনই তাঁহাকে ঠিক সেরূপভাবে বুঝে না। বুঝে বা না বুঝে জানি না, কিন্তু ব্রহ্ম বলিতে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইবে, ঈশ্বরের অন্য কোন বিদেশীয় নামে আমাদের মনে সে ভাব কখনই উদয় হইবে না। ব্রহ্ম একটি কথার কথা নহে, যে ইচ্ছা পাইতে পারে না, যাহাকে ইচ্ছা দেওয়া যায় না। ব্রহ্ম আমাদের পিতামহদের অনেক সাধনার ধন ;—সমস্ত সংসার বিসর্জ্জন দিয়া, সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়া, নিভৃত অরণ্যে ধ্যানধারণা করিয়া আমাদের ঋষিরা আমাদের ব্রহ্মকে পাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী। আর কোন জাতি ঠিক এমন সাধনা করে নাই, ঠিক এমন অবস্থায় পড়ে নাই, এইজন্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক জাতি বিশেষ সাধনা অনুসারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল তাহারা অন্য জাতিকে দান করে। এইরূপে সমস্ত পৃথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার ফল কি আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব ?

উদ্ভিজ্জ ও পশুমাংসের মধ্যে যে জীবনী শক্তি আছে, তাহা যে আমরা স্বায়ত্ত করিতে পারি, তাহার কারণ, আমাদের নিজের জীবন আছে। আমাদের নিজের প্রাণ

না থাকিলে আমরা নূতন প্রাণ উপার্জ্জন করিতে পারি না। আমাদের প্রাণ না থাকিলে উদ্ভিজ্জ, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি অন্য প্রাণীরা আমাদিগকে গ্রহণ করিত। এ জগতে মৃত টিকিতে পারে না, জীবিতের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। রামমোহন রায় যদি দেখিতেন, আমাদের জীবন নাই, তবে পারসীক মৃতদেহের ন্যায় আমাদিগকে মৃতভবনে ফেলিয়া রাখিতে দিতেন, খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি অন্যান্য জীবিত প্রাণীর উদরস্থ হইতে দিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি চিকিৎসা সুরু করিয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন, জীবন আমাদের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাকেই তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। আমাদের চেষ্টা হউক আমাদের এই জীবনকে সতেজ করিয়া তুলি, তবে আমরা ক্রমে বিদেশীয় সত্য আপনার করিতে পারিব। এইজন্যই বলি, প্রাচীন ঋষিদের উপনিষদের ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া আমাদের দেশে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লই, সার্ব্বভৌমিকতা আপনিই তাহার মধ্যে বিরাজ করিবে। ঈশ্বর যেমন সকলের ঈশ্বর, তেমনি তিনি প্রত্যেকের ঈশ্বর; যেমন তিনি জ্ঞানের ঈশ্বর, তেমনি তিনি হৃদয়ের ঈশ্বর; তিনি যেমন সমস্ত জগতের দেবতা, তেমনি আমাদের গৃহদেবতা। তাঁহাকে রাজা বলিয়াও দেখিতে পারি, তাঁহাকে পিতা বলিয়াও দেখিতে পারি। কিন্তু পিতা ঈশ্বর আমাদের যত নিকটের, তিনি আমাদের হৃদয়ের যত

অভাব মোচন করেন, এমন রাজা ঈশ্বর নহেন। তেমনি ব্রহ্মই ভারতবর্ষের সাধনালব্ধ চিরন্তন আশ্রয়, জিহোবা, গড্ অথবা আল্লা সেরূপ নহেন। রামমোহন রায় হৃদয়ের উদারতা-বশতই ইহা বুঝিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি হইলে ভারতের এ মর্ম্মান্তিক অভাব হয় ত তাঁহার চক্ষে পড়িত না। পিতামহ ঋষিরা যে ব্রহ্মকে বহু সাধনাদ্বারা আবাহন করিয়া আমাদের ভারতবাসীর হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আমাদের হীনতা-অন্ধকারে যে ব্রহ্মের মূর্ত্তি এতদিন আচ্ছন্ন হইয়া আছে, রামমোহন রায় সেই ব্রহ্মকে আমাদের হৃদয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমরা যদি তাঁহার সেই শুভসঙ্কল্প সিদ্ধ করি, তবেই তাঁহার চিরস্থায়ী স্মরণস্তম্ভ পৃথিবীতে স্থাপন করিতে পারিব। আমরা অগ্রে ভারতবর্ষের মন্দিরে সনাতন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিব, অবশেষে এমন হইবে যে, পৃথিবীর চারিদিক হইতে ধর্ম্মার্থীরা ভারতবর্ষের তীর্থক্ষেত্রে ব্রহ্ম-দর্শন-লালসায় দলে দলে আগমন করিতে থাকিবে, তখনই রাজা রামমোহন রায়ের জয়। তিনি যে সত্যের পতাকা ধরিয়া, ভারতভূমিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই পুরাতন সত্যের জয়। তখন সেই রামমোহন রায়ের জয়ে, ঋষিদের জয়ে, সত্যের জয়ে, ব্রহ্মের জয়ে, আমাদের ভারতবর্ষেরই জয়!